ভদ্রবেশী কেন বলিতেছি?

তবে পুলিস কোর্টে যথাসময়ে যাহা প্রকাশ পাইয়াছিল তাহা খুলিয়া বলি, সব বুঝিতে পারিবেন।

তথা কথিত গবেষক দুইজন সাদা পোষাকে পুলিসের এনফোর্স-মেণ্ট ব্রাঞ্চের লোক, সাহিত্যিকগণ সন্দেহভাজন ব্যক্তি, শহরে উঠতি-গুণ্ডা ধরপাকড় চলিতেছে।

কয়েক দিন পরে চৌ-মোড়ের সবাই দেখিতে পাইল চারজন যুবককে পুলিসের ভ্যানে তোলা হইতেছে। পাছে সাক্ষী হইতে হয় আশঙ্কায় সকলে সরিয়া দাঁড়াইল। কেহ ভাবিল ফেরারী আসামী, কেহ ভাবিল চোরা কারবারী, কিন্তু সত্যকার পরিচয় কেহই জানিতে পারিল না, কেহই অনুমান করিতে পারিল না যে উঠতি গুণ্ডা সন্দেহে ধৃত ব্যক্তিগণ চারজন উঠতি সাহিত্যিক।

সময়টা সেপ্টেম্বর, পূজার তখন আর মাস খানেক বাকি।

॥ দুই ॥

ম্যাজিস্ট্রেট পাবলিক প্রসিকিউটর বা পি-পি-র উদ্দেশ্যে বলিলেন, এদের ধরে আনলেন কেন, এঁরা নিরীহ সাহিত্যিক।

পি-পি এক সময়ে সাহিত্যিক হইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাই নিজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলিলেন, স্যার, উঠতি গুণ্ডা আর উঠতি সাহিত্যিক সব সময়ে প্রভেদ করা যায় না।

ম্যাজিস্ট্রেট॥ খুব যায়, এঁদের লেখা আমি পড়েছি। এঁর মাসিক 'কষ্টি-পাথর' সময় মতো বাড়ীতে না পৌছলে আমার স্ত্রীর মাথা ধরে। সর্বনাশ, এঁকে হাজতে রাখলে বা জেলে দিলে আমার গৃহ-বিপ্লব সুরু হয়ে যাবে। আর এঁর কবিতা পর পর দুদিন পড়লে

আমার কোষ্ঠকাঠিন্য দেখা দেয়—তাই বলে তাঁকে আইনের ফাঁকে ফেলা তো চলে না। আর এ দুজনের লেখাও অবশ্য পড়ে থাকবো কিন্তু এখন ঠিক মনে পড়ছে না।

পি-পি॥ কিন্তু হুজুর এঁরা প্রত্যেক দিন চৌমোড়ে কেন দাঁড়িয়ে থাকেন—সেটা কি সন্দেহজনক নয়?

ম্যাজিস্ট্রেট॥ সত্যই তো, কেন আপনারা নিত্য চৌমোড়ে দাঁড়িয়ে থাকেন?

সাহিত্যিকগণ যুক্ত আবেদনে জানাইল যে, স্যার, আমরা সাহিত্যিক, তবে ঘরোয়া সাহিত্যিক নই, ঘরের মধ্যে বসিয়া কল্পনা ও অলঙ্কারের সাহায্যে রচনা আমাদের কাজ নয়। আমরা পথে ঘাটে দোকানে বাজারে ও খাস পতিতে প্লট ও নরনারী (মানে নরনারীর চরিত্র) খুঁজিয়া বেড়াই। সেই উদ্দেশ্যেই কয়েকদিন আমরা কলেজ স্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের চৌমোড়ে দাঁড়াইয়া পর্যবেক্ষণ করিতেছিলাম। এমন সময়ে সংবিধানগত মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করিয়া পাষণ্ড (আচ্ছা পাষণ্ড কথাটা না হয় বাদ দিয়াই পড়িবেন) পুলিস অন্যায়ভাবে আমাদের ধরিয়া আনিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে অবিলম্বে আমাদের মুক্তিদান না করিলে পূজা সংখ্যা 'কষ্টি-পাথর' যথাসময়ে বাহির হইবে না আর তাহা ছাড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমাদের লিখিত ২৫০টি গল্প, বড় গল্প, ছোট উপন্যাস, উপন্যাস, কবিতা, রোমাঞ্চ প্রভৃতির স্থান শূন্য থাকিয়া যাইবে। তাহার ফলে অবাঞ্ছনীয় প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে—তাহার দায়িত্ব পুলিসকেই বহন করিতে হইবে।

ম্যাজিস্ট্রেট পি-পিকে বলিলেন, কি বলেন?

পি-পি 'পাষণ্ড' শুনিয়া বিষম চটিয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন, স্যার, আমার আপত্তি আছে। আমি ইহাদের বিরুদ্ধে রীতিমতো সাক্ষী প্রমাণাদি উপস্থিত করিব।

সাহিত্যিকদের প্রত্যেকের মনে যুগপৎ নিজ নিজ বহুতর অশ্লীল গল্প-উপন্যাস প্রভৃতির স্মৃতি উদিত হইল।

ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, তবে ইঁহাদের জামিনে খালাস দিই।

পি-পি ॥ আপত্তি নাই, কিন্তু জামিন হইবে কে ?

ভিড়ের মধ্যে সাহিত্যিক সমাজের 'গার্জেন' উপস্থিত ছিলেন, তিনি বলিলেন, আমি জামিন হইব।

সাহিত্যিকগণ জামিনে খালাস পাইয়া বাড়ী আসিল।

পরে সরকার হইতে মামলা তুলিয়া লওয়ায় তাহারা বেকসুর খালাস হইয়াছিল, কিন্তু অতঃপর আর তাহারা চৌমোড়ে দাঁড়াইয়া প্লট সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করে নাই, ঘরে বসিয়াই লিখিত। এখন তাহারা প্রসিদ্ধ ঘরোয়া সাহিত্যিক।

পশু শিক্ষালয়

দেশপ্রিয় পার্কের যে-অংশটা নৈমিষারণ্য নামে পরিচিত সেখানে অপরাহ্নে একদল পেন্সন ও যষ্টিধারী বৃদ্ধ বসিয়া ধর্ম্মালোচনা করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ তাঁহাদের সমাগমের ফলেই স্থানটি নৈমিষারণ্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

একদিন অপরাহ্নে সেখানে হরিবাবু (যষ্টি ও পেন্সনধারী একজন বৃদ্ধ) কিঞ্চিৎ বিলম্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অপর সকলে একযোগে বলিয়া উঠিল—আজ আপনার বিলম্ব কেন হরিবাবু?

কথিত হরিবাবু ধীরে-সুস্থে আসন গ্রহণ করিতে করিতে বলিলেন, আর বলবেন না, যেমন হয়েছে দেশের সরকার।

সরকারের অবিমৃশ্যকারিতা সম্বন্ধে সকলেই একমত, সরকারের নানা প্রকার অপরাধের মধ্যে প্রধানতম হইতেছে যে পেন্সনের সঙ্গে D. A. নামে মধুর স্পৃহনীয় উপসর্গটা নাই। কাজেই একজন বলিলেন, আবার নতুন কি হল?

নতুন কোথায়, নিত্য আর পুরাতন।

হরিবাবুর নিত্য আর পুরাতন অভিজ্ঞতা শুনিবার জন্যে সকলে আগ্রহ প্রকাশ করিল।

হরিবাবু আরম্ভ করিলেন—নাতিটিকে স্কুলে ভর্ত্তি করবার জন্যে আজ মাসখানেক চেষ্টা করছি। যেখানেই যাই শুনি, জায়গা নেই। আরে মোলো যা, পড়বে তার আবার জায়গার কি প্রয়োজন? এ কি খাওয়া না শোয়া? সকলেই জানায়, অতিরিক্ত নিলে সরকার থেকে গ্র্যাণ্ট বন্ধ করে দেবে। শুনুন একবার কথা। গ্র্যাণ্ট বন্ধ করবে! কেন,

গ্র্যাণ্ট কি সরকার ঘর থেকে দেয়! যাই হোক, এইভাবে স্কুল থেকে স্কুলে মাস খানেক ঘুরে ভর্ত্তি করবার আশা যখন ছেড়ে দিয়েছি তখন পেলাম একটা স্কুলের সন্ধান।

অবশ্য সেখানেও নানারকম আপত্তি উঠিয়েছিল কিন্তু হাতে পায়ে ধরে দিলাম শেষ পর্য্যন্ত ভর্ত্তি করে।

যাক্, তাহলে আপাততঃ আপদ শান্তি। অপরে বলিলেন, নামটা শুনে রাখি, কাজে লাগতে পারে।

হরিবাবু বলিলেন, স্কুলটার নাম নিখিলবঙ্গ পশু বিদ্যালয়।

একজন বলিলেন, তার মানে ভেটারিনারি স্কুল?

অপরে বলিলেন, বেশ করেছেন—ওর prospect আছে। পশু চিকিৎসা জানা এ দেশে খুব দরকার।

হরিবাবু বলিলেন, ভেটারিনারি স্কুল নয়, সেখানে তো হয় পশুর চিকিৎসা। এখানে খোদ পশুরা শিক্ষা পায়।

বলেন কি মশায়?

যা দেখলাম তাই বলি। বাঘ ভালুক শেয়াল কুকুর বেড়াল বানর গাধার বাচ্চারা পাশাপাশি বেঞ্চিতে বসে লেখা পড়া শিখছে।

বিস্মিত হইয়া সকলে শুধায়, আর হেডমাষ্টার, শিক্ষক পণ্ডিত প্রভৃতি।

তারাও পশু, তবে বয়স বেশি, হেডমাষ্টার একটা বুড়ো ষাঁড়।

বলেন কি মশায়, এমন স্কুলের নাম তো জানতাম না।

একটিই আছে কি না। তা ছাড়া, ওরা আত্মপ্রচার পছন্দ করে না।

তা মানুষের ছেলেকে নিতে চাইলো?

সেই তো বিপদ! বলে, মানুষের ছেলের সাহচর্য্যে পশুর বাচ্চারা খারাপ হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি নাছোড়বান্দা হয়ে হাতে পায়ে ধরে, আমার নাতিটাই পশু হয়ে উঠবে, পশুরা মানুষ হবে না, এমনি কত সব স্তোক বাক্য বলে দিলাম শেষ পর্য্যন্ত গছিয়ে।

হেডমাষ্টার বললেন, আচ্ছা নিলাম ছোকরাকে স্পেশাল কেশ হিসাবে —আর অনুরোধ করবেন না।

হরিবাবুর অভিজ্ঞতা শুনিয়া সকলের বিস্ময়ের অভিজ্ঞতা রহিল না, এবং সকলেই মনে মনে ভাবিতে লাগিল—হরিবাবু খুব জিতে গেল। আমাদের ছেলেপিলে নাতিরা মানুষ ছাড়া তো আর কিছু হবে না, হরিবাবুর নাতি আস্ত একটা পশু হবে। আঃ, কি সৌভাগ্য হরিবাবুর।

তারপরে সকলে মনের ঈর্ষ্যা গোপন করিয়া এবং হরিবাবুর সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিয়া উঠিয়া পড়িলে সেদিনের মতো নৈমিষারণ্যের অধিবেশন সমাপ্ত হইল।

॥ দুই ॥

মাসখানেক পরে হরিবাবু আবার একদিন সময় অতিক্রম করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নৈমিষারণ্যের সহধর্ম্মীগণ বলিয়া উঠিল— আবার আজ হঠাৎ দেরী কেন?

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া হরিবাবু বলিলেন, আর বলবেন না, কপাল!

কি হল মশায়?

নাতিটাকে স্কুল থেকে আনিয়ে নিতে বাধ্য হলাম।

কেন? পশুর সঙ্গে থেকে কদভ্যাস শিখছিল বুঝি?

না, পশুরাই ওর সাহচর্য্যে কদভ্যাস শিখছিল এই অভিযোগ!

কি আশ্চর্য্য!

আশ্চর্য্য বোধ করবেন না—সমস্তটা শুনুন।

হরিবাবু বলিতে লাগিলেন, হেডমাষ্টারের জরুরি চিঠি পেয়ে গিয়ে হাজির হলাম। ব্যাপার কি?

তিনি বললেন, আপনার নাতিটিকে নিয়ে যান মশায়।

কেন, তার অপরাধ কি ?

অপরাধ তার ব্যক্তিগত না হতে পারে, ওটা মানুষের জাতিগত স্বভাব।

খুলেই বলুন।

হেডমাষ্টার বলতে লাগলেন, পশুরা কদভ্যাস শিখছে ওর কাছ থেকে!

বলেন কি ? পুঁটে আমার ভালো ছেলে, রোজ দু'বেলা গীতা পড়ে।

তা পড়ুক—সবটা শুনুন।

হেডমাষ্টার বলে চলেন—পশুরা সবাই সবাইকে আপন মনে করে, এ পর ও আপন এ জ্ঞান আমাদের নেই। আপনার পুঁটে এ জ্ঞানটি ইতিমধ্যে বাচ্চাদের দিয়েছে।

কেমন ?

দু'টো কুকুরের বাচ্চা পরস্পরকে ভাই বলে জানে। ও বলল, তোরা আপন ভাই, না বৈমাত্র, না খুড়তুতো-জেঠাতো, না কেবল গ্রাম সম্পর্কে ভাই ?

ক্ষতি কি ?

মনুষ্য-সমাজে ক্ষতি না হতে পারে—পশু-সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর, ওতে সমাজের ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়।

আর কি অভিযোগ ?

পশুদের সকলের অপরের দ্রব্যে সমান অধিকার, এটা আমার, ওটা অপরের, এ বোধ তাদের নেই। আপনার পুঁটের কল্যাণে সবাই এখন জিনিসপত্রে আপন পর ভেদ করতে শিখেছে।

ক্ষতি কি—মানুষের সমাজে তো এমন চলে।

তাই মানুষের সমাজের আজ এমন অবস্থা।

আর কি অভিযোগ ?

কত বলবো। পুঁটে বাচ্চাদের চুরি করতে, মিথ্যা কথা বলতে

শেখাচ্ছে। আবার এর মধ্যে একদিন সবাইকে নিয়ে মিছিল বের করে কি সব চাই বলে ঘোষাচ্ছিল! গেল আমাদের পশু-সমাজ। না মশাই, নিয়ে যান আপনার নাতিকে।

খুব রাগ হল আমার, বললাম, এ ষাঁড়ের মতোই কথা বটে।

শুনে, বলবো কি মশাই, বেটা বুড়ো বলীবর্দ্দ এমন এক বিরাট গর্জ্জন করে উঠল যে কোথায় লাগে তার কাছে সত্যাগ্রহীদের অহিংস গর্জ্জন!

সবাই শুধায়, কি করলেন তখন?

যে শিং নাড়া, যে গর্জ্জন, আর কি করবার থাকতে পারে, নাতিটার হাত ধরে পালিয়ে চলে এলাম।

তা নাতিকে এবারে কোথায় ভর্ত্তি করে দেবেন ভাবছেন?

না, আর ইস্কুলে নয়।

তবে?

এবারে ভাবছি বড়বাজারের এক গদিতে ঢুকিয়ে দেব।

ব্যবসা শেখাবেন বুঝি! ভালো, ভালো।

হ্যাঁ, ব্যবসাই এক রকম।

এক রকম মানে? ব্যবসার কি আবার রকম ভেদ আছে নাকি?

সব ব্যবসার সেরা ব্যবসা শেখাবো ওকে।

কি সেটা?

জানেন সবাই, কেবল সাহসের অভাবে স্বীকার করতে পারছেন না।

তবু শুনি কি সেটা?

চোরা-কারবার।

সকলে স্বস্তির সঙ্গে বলিল—এই! আমরা ভাবছিলাম না জানি সেটা কি! তা চোরা-কারবারে আবার সাহসের কি প্রয়োজন! স্যায্য কারবারেই আজ প্রয়োজন হয় সাহসের।

এই বলিয়া সকলে সরকারের সমালোচনায় আত্মনিয়োগ করিল।

হরিবাবু উঠিয়া পড়িলেন। বড়বাজারের গদি শিক্ষানবিসির মাশুল হিসাবে যে টাকাটা দাবী করিয়াছে তাহা জোগাড় করিতে হইবে।

প্রত্যাবর্তন

অপুত্রক মাতুল নিবারণবাবুর নাভিশ্বাস উঠেছে, শেষ সময় উপস্থিত, খবর পাওয়া মাত্র উপযুক্ত ভাগ্নে সত্যশরণ উল্লসিত হয়ে এক দৌড়ে তারাচরণের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। তারাচরণ উকিল আর সত্যশরণের তাস খেলার নিত্যসঙ্গী।

তারাচরণ তার ত্রস্ত ভাব দেখে বলল, কি, হয়ে গিয়েছে নাকি?

সত্যশরণ বলল, না ঠিক হয়নি, তবে হল বলে। তারপরে একটু ভেবে নিয়ে বলল, এতক্ষণে হয়েই গেল বা।

এমন তো কতবার শুনলাম। কাক-জ্যোৎস্না দেখে কতবার তুমি উল্লাসে কা কা ধ্বনি করে উঠেছ মনে আছে কি?

এবারের কথা আলাদা।

কেন শুনতে পাই কি?

সাহেব ডাক্তার এসেছে যে। ওরা শুধু ফিস নিয়েই ক্ষান্ত হয় না, সঙ্গে দক্ষিণা স্বরূপে রুগীর প্রাণটাও নিয়ে যায়। পাড়ার ডাক্তার বলে গেল।

তাই বলো, একেবারে ঘোড়ার মুখের খবর।

তা বলতে পারো, কেননা আমাদের শাস্ত্রে বৈদ্যকে অশ্বিনীকুমার বলেছে।

তারপরে সত্যশরণ বলল, আর তো দেরি করা চলে না।

তা বটে, তবে চলো শ্মশান বলেই যাই।

আহা, তোমাকে শ্মশানে যেতে বলছে কে? তবে শ্মশানের

কাছে বলতে পারো, কেননা, ঐ জায়গাটার আগেই রাজদ্বারের উল্লেখ আছে, রাজদ্বারে শ্মশানে চ য তিষ্ঠতি স বান্ধব।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু ধরো নিবারণবাবু যদি উইল করে দিয়ে যান।

দিয়ে গেলেই হল! তোমরা আছ কি করতে?

আমরা তো আর রাতকে দিন করতে পারি না।

খুব পারো। নজীর আর আইনের বিদ্যুতের বাতি জ্বেলে রাতকে দিন করে দাও।

আরে সেটা তো সেও করতে পারে।

কে? ঐ তিনকাল গত বুড়িটা? তা হলে আর তোমরা আছ কি করতে?

শহরে উকিল কি আমি একাই?

একা নও, একাই একশ।

আচ্ছা একটু স্থির হয়ে বসো, এই রাতেই তো রাজদ্বারে যেতে হচ্ছে না।

এই বলে তারাচরণ তাস বের করল।

সত্যশরণ এবারে আর আশাভঙ্গ হল না, শেষ রাত্রে নিবারণবাবু সত্য সত্যই শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করলেন।

নিবারণবাবু এঞ্জিনিয়ারিং পরীক্ষায় বারকয়েক ফেল হয়ে মধ্যপ্রদেশে যখন চলে গেলেন তখন তাঁর বয়স ত্রিশের অনেক নীচে। তারপরে সেখানে কণ্ট্রাক্টরী করে পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়সে যখন তিনি ফিরে এলেন তখন নিয়ে এলেন অনেক টাকা আর সেই সঙ্গে তুলসীকে।

অন্তরঙ্গ বন্ধুরা বলল, ওখানে যা করেছ করেছ, এ বাংলাদেশ। বিয়ে করে ফেলো।

নিবারণবাবু বললেন, তা সম্ভব হলে তো ওখানেই হতো। তুলসী বিয়েতে রাজী নয়।

তবে বিয়ে করেছ বলে চালিয়ে দাও, জানছে কে?

তুলসী তাতেও রাজী নয়।

বন্ধুরা অবাক হয়ে বলে, এমন তো কখনো শুনিনি।

নিবারণবাবু বলেন, তুলসীকে তো আগে দেখনি।

কিন্তু বন্ধুরা বলে, তুমি মরলে উত্তরাধিকার নিয়ে যে সঙ্কট হবে।

সে কথা কি আর বলিনি?

কি বলেন উনি?

বলে যে, তোমার কাছে আসবার আগেও আমি ছিলাম, তখন কি ভেবেছিলে আমার জন্যে? তুমি চলে যাওয়ার পরেও আমি যদি থাকি, তখনি বা ভাবতে যাবে কেন?

আমি বলি, ও কেনর জবাব এই যে মানুষের স্বভাব। তুলসী বলে, মানুষ কি শুধু এক রকমের হয়ে থাকে।

তখন বন্ধুরা শুধোয়, কিন্তু তুমি কি স্থির করেছ?

নিবারণবাবু বলেন, তুলসী যাই বলুক আমি স্থির করেছি, আমার যা আছে, থাকবার মধ্যে এই বাড়িটা আর কিছু টাকা উইল করে ওকে দিয়ে যাবো।

প্রতিবেশী সত্যশরণটার আশা নেই জেনে বন্ধুরা আনন্দ অনুভব করে বলে, হাঁ, উনি যাই বলুন না কেন, তোমার তো একটা কর্তব্য আছে।

বেশী কথা বলা নিবারণবাবুর স্বভাব নয়, তিনি চুপ করে থাকেন।

মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত ডোঙারগড়ের কাছে একটা শালের জঙ্গল কিনে নিয়ে যখন নিবারণবাবু কাঠের ব্যবসা শুরু করেন তখন তাঁর

পুঁজি অল্প ছিল, অভিজ্ঞতাও বেশি ছিল না, ছিল অন্তহীন আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায় আর সম্মুখে দীর্ঘপ্রসারিত যৌবন। এর যে কোনটার অভাব হলে তাঁর ব্যবসা চলত না বরঞ্চ তাঁকেই চলে আসতে হত। কাঠের ব্যবসায়ীর জীবন আর যাই হোক সুখের নয়, নিরাপদ তো নই। বনের মধ্যেই তাদের বাস, মাঝে মাঝে রেল স্টেশনে আসতে হয় মালগাড়ি পাওয়ার তদ্বিরে, মাঝে মাঝে শহরে যেতে হয় ব্যাঙ্কে টাকা তুলতে রাখতে, তাছাড়া বাকি সময় বনবাস। শাল গাছের রলা পুঁতে তার উপরে শাল কাঠের তক্তা দিয়ে ঘর তৈরী হয়, উঠবার জন্যে আছে সিঁড়ি, রাতের বেলায় টেনে তুলে নিতে হয়। বাস, সারারাত শাল কাঠের বাক্সবন্দী হয়ে থাক, বাইরে চলতে থাকে অরণ্যের রহস্যময় শব্দ আর তার সঙ্গে শ্বাপদের গর্জন। কখনো কখনো হাতী এসে পিঠ চুলকে যায়, শালের রলায় ঘরটা কাঁপতে থাকে। শহরে বসে এ সব কথা শুনতে বা পড়তে যত ভয়াবহ মনে হয় আসলে তেমন কিছু নয়—অন্তত ঐ জীবনে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের এই ধারণা।

নিবারণবাবু জঙ্গলের অনেকটা অংশ নিজে লোক রেখে কাটাতেন, বাকিটা স্থানীয় ঠিকেদারদের ইজারা দিয়ে দিতেন। কাজেই বনের মধ্যে তার বাসস্থানের কাছেই অনেকগুলো ঘর তৈরী হয়ে ছোট একটি গ্রামের পত্তন হয়েছিল। ঠিকেদারেরা সবাই ঐ অঞ্চলের লোক, অধিকাংশই জাতে গোয়ালা। তাদেরই কারো ঘরে রাঁধাবাড়ার কাজ করত তুলসী। নিবারণবাবু পরে অনেক সময়ে ভেবেছেন যে, আগে কি কখনো তুলসীকে দেখেছেন—না, তাঁর মনে পড়ে না। প্রথম যখন তিনি তুলসী সম্বন্ধে সচেতন হলেন, দেখলেন তুলসী ছাড়া কেউ কোথাও নেই, সকলেই ভোজবাজির মতো অন্তর্হিত হয়েছে, তারপরে বুঝলেন যে তাঁর টাকার থলিটিও ভোজবাজির ভোজ্য জোগাবার জন্যে অন্তর্ধান করেছে। সেই জনশূন্য পত্তনে রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় আছেন তিনি আর তাঁর শিয়রে আছে

কিশোরী তুলসী আর আছে অরণ্য আর শ্বাপদ আর দিবারাত্রির নিয়মিত আবর্তন।

অটুট স্বাস্থ্য সত্ত্বেও হঠাৎ নিবারণবাবু গুরুতর পাড়িত হয়ে জ্বরে অচৈতন্য হলেন। ওদেশের লোকে ব্যাধির অভ্যস্ত শিকার নয় বলেই ব্যাধিকে বড় ডরায়, তাকে মৃত্যু বলেই মনে করে। তাই তারা এক রাত্রের মধ্যে সরে পড়ল আর এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার ফিনিশিং টাচ হিসাবে নিবারণবাবুর টাকাকড়িও সঙ্গে নিতে ভুলল না। ডাক্তার বৈদ্য না থাকায় মাত্র চার পাঁচদিন পরেই নিবারণবাবুর জ্ঞান হল, দেখলেন শিয়রে কে একজন উপবিষ্ট।

তিনি শুধোলেন—তুমি কে?

সে বলল—আমি তুলসী।

ক্লিষ্টভালে রেখা সঞ্চার করে রুগী মনে আনতে চেষ্টা করলেন এই তুলসী কে? মনে হল না যে, তাঁর কিছু মনে পড়ছে, তবু এটুকু বুঝলেন যে তুলসী তাঁর আপন, তখন তিনি তুলসীর ছোট্ট হাতখানা নিজের বুকের উপরে টেনে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তভাবে ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাপ যত বেশী দেওয়া যায় পাক তত শীঘ্রই হয়, পদার্থ বিজ্ঞানের এই নিয়ম বোধ করি মানুষের মন সম্বন্ধেও খাটে, নতুবা নিবারণ ও তুলসীর সাহিত্য এত দ্রুত পরম পরিণতির দিকে এগোবে কেন? ভূস্তরের চাপে অঙ্গার হীরক হয়ে ওঠে, সঙ্কটের চাপে ওদের মধ্যে যে আলো জ্বলে উঠল তার আলোয় নিবারণবাবু নিজের এক নূতন রূপ আবিষ্কার করলেন আর আবিষ্কার করলেন তুলসীকে। সে আজ তাঁর জীবনে সবচেয়ে সত্য। এতদিন তাকে জানতেন না ভেবে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। তার উপরে সে কাছেই ছিল অথচ চোখে পড়েনি। ঘরে আলো ছিল না বলেই শিয়রে পিপাসার জল থাকা সত্ত্বেও চোখে পড়ে নি। এতদিনে আলো জ্বলেছে। নিবারণবাবু ভাবেন

তুলসীর মনেও কি জ্বলছে আলো? ঐটুকু সংশয় প্রেম থেকে ঘুচতে চায় না। প্রেম করতলগত আমলক নয়, পদ্মপত্রে জল। নিবারণবাবুর এসব ব্যাধি ছিল না, এতদিন তিনি গাছকে দেখেছেন কাঠরূপে, আজকে তাঁর বিস্ময়ের অন্ত থাকে না যখন তিনি দেখেন যে তাতে পত্র আছে পল্লব আছে পুষ্প আছে। তুলসীর খোঁপায় সেদিন একটি ফুলের গুচ্ছ দেখে শুধোলেন—এটা কি ফুল তুলসী?

বিস্মিত তুলসী বলে—সে কি কথা বাবু, এ যে শাল ফুল।

সকলে তাঁকে বাবু বলতো, তুলসীও বাবু বলে।

নিবারণবাবু বলেন, ওটা ছাড়।

কেন সবাই তো বাবু বলে তোমাকে।

তুমি আর সবাই কি এক।

তবে কি বলবো?

একটু ভেবে নিয়ে নিবারণবাবু বলেন, 'ওগো' বলে ডেকো।

হাসিতে তুলসীর খোঁপার শালের মঞ্জরী দুলে দুলে ওঠে, 'ওগো' কি আবার একটা ডাক।

তবে তোমাদের দেশে কি বলে?

কাকে কি বলে?

সম্বন্ধটা মুখে আসে না নিবারণবাবুর, তিনি পরাজয় স্বীকার করেন।

অসুখের জের মিটিয়ে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য লাভ করতে এক মাসের উপর লাগল নিবারণবাবুর। সুস্থ হয়ে উঠে তুলসীকে বললেন, এবারে ঘরে ফিরে যাও।

তুলসী বলল, যারা পালিয়েছে আগে ফিরে আসুক।

তারা আর ফিরবে না, বলেন নিবারণবাবু।

তবে আমিই বা যাই কি করে, বলে তুলসী।

তোমার যে বাপ মা আছে।

ভয় তো সেই জন্যেই।

সে আবার কি রকম ?

একমাসের উপরে তোমার ঘরে থাকলাম তারপরে আর তারা ঘরে নেবে কেন ?

বাপ মা নেবে না। বলো কি ?

বাপ মুখে কিছু বলবে না, কিন্তু মা ?

মার মন যে নরম।

বরফ হলে আর জল নরম থাকে না।

তুলসীর উত্তর শুনে অবাক হয়ে যান নিবারণবাবু। অশিক্ষিত দেহাতী মেয়ের মুখে এসব কথা জোগায় কে ?

তবু তিনি আর একবার চেষ্টা করেন, বলেন, তুমি ফিরে না গেলে তোমার বাপ-মায়ের কষ্ট হবে না ?

এ অবস্থায় ফিরে গেলে কষ্ট হবে আরো বেশি।

তুমি যে এখানে আছ তা কি তারা জানে ?

জেনেও জানে না। আমি যাদের সঙ্গে এসেছিলাম তারা গাঁয়ের লোকমাত্র আপনজন নয়। তারা ফিরে গিয়ে নিশ্চয় সব প্রকাশ করে দিয়েছে।

তা হলে যে নিজেদের হাত সাফাই-এর কথাটাও বলতে হয়। তবে কি বলেছে ?

এমন ক্ষেত্রে যা বলে থাকে, তোমাদের মেয়েকে বুড়োর বাপে নিয়ে গিয়েছে।

বুড়োর বাপ আবার কি ?

বাঘ গো বাঘ। গোণ্ডিয়ায় সাহেবদের কুঠি হওয়ার পর থেকেই এখানকার অনেক মেয়েকে বাঘে নিচ্ছে কিনা। এই বলে হাসে।

মেয়েটির ক্ষুরধার বুদ্ধিতে সহজাত ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হন নিবারণবাবু। দুঃসময়ের বন্ধুকে তিনি তো তাড়াতে পারেন না, বিশেষ এখন তাঁর দুঃসময়। অতএব তুলসী রয়েই গেল। যে ঘরকাও নয় ঘাট-কাও নয় শেষ পর্যন্ত তার স্থান হয় হৃদয়ের মধ্যে। এক্ষেত্রেও তাই

হল। সমাজ যেখানে নেই সামাজিক সম্বন্ধও সেখানে থাকে না, তাই কোন অস্বস্তি দেখা দিল না।

নিবারণবাবু দেখলেন এখানে আর ব্যবসা করা হবে না, কেননা যারা প্রধান সহায় হতে পারত তারাই এখন পলাতক। তিনি এখানকার দেনা-পাওনা চুকিয়ে সিংভূম জেলায় সারান্দা জঙ্গলে গিয়ে কাঠের ব্যবসা শুরু করলেন। তুলসীকে নিজের স্ত্রী বলেই পরিচয় দিলেন, সে আপত্তি করল না।

এমনভাবে বছর কুড়ি গেলে বিস্তর টাকা জমানো হয়েছে মনে হল নিবারণবাবুর। তিনি ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে কলকাতায় রওনা হওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। তুলসী আগেও যেমন আপত্তি করেনি এখনও তেমনি আপত্তি করল না।

কলকাতা যাত্রার কয়েকদিন আগে নিবারণবাবু বললেন, তুলসী আমরা তো কলকাতা চললাম।

তুলসী নির্বিকারভাবে বলল, সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

তার উত্তরে কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে নিবারণবাবু বললেন, তোমার ভয় করছে না?

তুলসী আবার নির্বিকারভাবে বলল, ভয় তো জঙ্গলে—বাঘ ভালুক আছে।

জনপদেও ভয় আছে, সেখানে পরিচয় দেবে কি বলে?

সে দায় আমার নয়, বলে হাতের কাজ করে যায় তুলসী।

ধরো স্ত্রী বলেই যদি পরিচয় দি।

তাই দিয়ো, নইলে আবার তোমার লজ্জা।

তোমার?

বুনো মানুষের আবার লজ্জা কি? আর তাছাড়া সেখানে আমাকে চেনে কে?

এবারে বার দুই ঢোক গিলে নিবারণবাবু বলেন—আচ্ছা বিয়েটা করে ফেললে দোষ কি?

লাভই বা কি ?

লাভ না থাক ক্ষতি আছে।

কি রকম শুনি।

আমার মৃত্যুর পরে বিষয় সম্পত্তির অধিকার নিয়ে গোলযোগ উপস্থিত হবে।

এ-ই ? বলে আবার কাজ করে যায় তুলসী।

চুপ করে থাকলে যে ?

আমার ক্ষতি আমি বুঝবো, তোমার যদি কিছু লাভ থাকে তো বলো।

নিবারণবাবু বুঝতে পারেন না, এতদিনেও বুঝতে পারেননি তুলসীকে। চুপ করে থাকেন।

এবারে তুলসী বলে, চুপ করে থাকলে যে।

তোমাকে বুঝতে পারলাম না তুলসী।

না বুঝে যদি কুড়ি বছর চলে থাকে তবে এখনো চলবে। নাও এখন যাওয়ার উজ্জুক করো।

॥ দুই ॥

নিবারণবাবু তুলসীকে নিয়ে কলকাতার বাড়িতে এসে উঠলেন। আগেই এক বন্ধুকে দিয়ে বাড়িটি কিনিয়ে রেখেছিলেন। মস্ত বাড়ি। তুলসী কলকাতা শহর দেখে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। বিলাসপুর শহর সে দেখেছিল, ভেবেছিল কলকাতা শহর সে রকম কিছু হবে। কিন্তু এ যে সম্পূর্ণ অন্য এক রাজ্য। তার মনে হল যেন প্রকাণ্ড একটা দৈত্যের মুখের মধ্যে সে প্রবেশ করল। তারপরে বাড়িটা। তিনটা তলায় কত ঘর, কত বারান্দা, কত ছাদ। একটা কোণের ঘরে সে মুহ্যমান অবস্থায় বসে রইল।
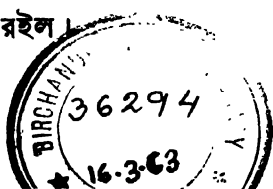
নিবারণবাবু প্রচুর টাকা-রোজগার করে ফিরেছেন সংবাদ পেয়ে আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব দেখা করতে এল। কেউ বলল নিবারণ জেঠা, কেউ বলল নিবারণ দাদা, কেউ বলল নিবারণ ভায়া। সকলের সম্বোধনকে ডুবিয়ে দিয়ে শোনা গেল সত্যশরণের গলা, নিবারণ মামা—সঙ্গে সঙ্গে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত। সে খবর নিয়েছিল নিবারণের ছেলেপিলে নেই, সে হচ্ছে আইনসিদ্ধ একমাত্র উত্তরাধিকারী। মামী আছে বটে, তা বুড়ি আর কতদিন।

তুলসী সকলের সঙ্গে মিশতে চেষ্টা করে, পারে না, কেমন যেন বাধো বাধো করে—কোথায় যেন বাধা।

নিবারণবাবুর এত বড় যে বাড়ি তা দেখতে দেখতে পূর্ণ হয়ে গেল, মৌমাছিতে যেমন চাক পূর্ণ হয়ে যায়—আর উঠল তেমন কলগুঞ্জন। আর মধু! সকলেই তার সন্ধানে আছে, সকলের আর সকলের চেয়ে বেশী দাবি সেই মধুভাণ্ডের উপরে।

প্রথমে কার মনে সন্দেহ জাগল কেউ বলতে পারে না, কেন বা কেমন করে সন্দেহ জাগল তাও কেউ বলতে পারে না—তুলসী নাকি রক্ষিতা মাত্র—পত্নী নয়। তখন ত্রিকালগত অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী বুড়ির দল বহু দূরবিসর্পী, বহু দিগন্তস্পর্শী কুটিল জটিল প্রশ্ন নিক্ষেপ করে সত্য আবিষ্কার করে ফেলল। আর তুলসীও রাখ্ ঢাক না করে স্পষ্টভাবেই বলে ফেলল—বাবুর সঙ্গে আমার তো বিয়ে হয়নি।

তবু আছ কি করে?

রেখেছেন তাই আছি।

লজ্জা করে না?

এতদিন তো করতো না। আর লজ্জার আছেই বা কী। আমাকে না হলে যে বাবুর চলে না।

গলায় দড়ি, গলায় দড়ি।

এক সঙ্গে অনেকগুলি শীর্ণ হাত অনেকগুলি শীর্ণ গাল স্পর্শ করে।

ভোজবাজির মতো নিবারণবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ি শূন্য হয়ে যায়।

সত্যশরণ উকিল সাক্ষী করে শপথ করে বুড়ো মরলেই বুড়িকে দেখে নেবে।

উকিল তারাচরণ বলে, ধরো যদি তাকে উইল করে দিয়ে যায়। দিয়ে গেলেই হল, তোমরা আছ কি করতে। তাছাড়া আমি শাস্ত্রসম্মত একমাত্র উত্তরাধিকারী। হিন্দু আইন ইংরেজের আইন দু-ই আমার পক্ষে।

তবে অপেক্ষা করে থাকো বুড়ো মরুক।

সেই শুভদিন আজ সমাগত। মানুষ অমর নয় এই পুরাতন সত্য পুনরায় প্রতিপাদিত করে নিবারণবাবু মারা গিয়েছেন।

সত্যশরণ লোকজন নিয়ে এসে উপস্থিত হল। পাড়াপড়শীরা মৃতদেহ নিয়ে গেল। সত্যশরণ সঙ্গে গেল না, তারাচরণকেও যেতে দিল না। কী জানি বুড়ি কি করে বসে, সঙ্গে একজন উকিল থাকা ভালো। বলা বাহুল্য তুলসীর খোঁজ নেওয়া কেউ আবশ্যক বোধ করল না, হাজার হোক বিবাহিতা পত্নী তো নয়, রক্ষিতা মাত্র! তার আবার শোক কি।

পরদিন প্রাতে তুলসীকে দেখা গেল না। সত্যশরণ বলল, বেটি থানা পুলিসে গেল, না উকিলের বাড়িতেই গেল?

তারাচরণ বলল, তোমার অত খোঁজে দরকার কি? আইনে বলে Possession is right! তুমি চেপে বসে থাকো। সত্যচরণ চেপে বসে তো রইলই, উপরন্তু দরজায় দারোয়ান বসিয়ে দিল। তারপরে দুইজনে মিলে নিবারণবাবুর কাগজপত্র ঘাটতে শুরু করল। অধিক গবেষণা করতে হল না, উপরেই পাওয়া গেল উইল; তিনি তাঁর সর্বস্ব তুলসী দাসীকে দিয়ে গিয়েছেন। তারাচরণ পরামর্শ দিল, এখনি পোড়াও। তৎক্ষণাৎ ভস্মীভূত উইল পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেল।

সত্যশরণ নিশ্চিন্ত হল।

॥ তিন ॥

ডোঙারগড় স্টেশনে তুলসী যখন নামল তখন সন্ধ্যা হয় হয়। গায়ে তার একখানি চাদর, সঙ্গে কোন জিনিসপত্র নাই। গেটে টিকিট দিয়ে সে বনের দিকে চলল—অদূরে ঘন অরণ্য। বনের মধ্যে প্রবেশ করে দেখতে পেল, বাঁধে জল বেধে রয়েছে; সেখানেই বসে পড়ল, পা আর চলে না। হাঁটু দুটো বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্থির হয়ে বসতেই চোখের জলের সাতনরী হার দুলল বুকের উপরে। এই পড়ল তার প্রথম চোখের জল নিবারণবাবুর মৃত্যুর পরে। কেন সে কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল ভালো করে জানে না, কেবল এইটুকু জানে যে, ওখানে তার আর আশ্রয় নাই। পরম দুঃখে পড়লে মেয়ের যেমন বাপের বাড়ির কথা মনে পড়ে তেমনিভাবে স্বভাবতই তার মনে পড়ল বনের কথা, যে বন থেকে সে এসেছিল কলকাতায়। কিন্তু দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে পিতৃগৃহ যে তার পর হয়ে গিয়েছে এই প্রথম সে বুঝল। জঙ্গল আজ তার কাছে সত্যই অরণ্য।

রাত্রির প্রহরগুলো ক্রমে অধিকতর ভারী হয়ে জমতে লাগল অরণ্যের শিরে, নিশাচর পাখির অশুভ রব, শ্বাপদের গর্জন, সহস্র তরুলতা বনস্পতির রহস্যময় কানাকানি ক্রমে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, আর শাখা পল্লবের ফাঁক দিয়ে জ্যোৎস্নার সুতো ঝুলে পড়ে—সেই সমস্ত অরাজক উপাদানকে একটি মাল্যে গ্রথিত করে তুলতে বৃথাই চেষ্টা করতে থাকল। এই প্রকাণ্ড নৈসর্গিক রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে অফুরন্ত চোখের জলের সূত্রধাররূপে নিস্পন্দ বসে রইল তুলসী। অবশেষে রাত্রিও শেষ হয়ে এল, শেষ হল না

ওর অশ্রুজলের। যে মানুষকে এতকাল সে আশ্রয় করে ছিল, সেও গিয়েছে আর যে জঙ্গল ওর পিতৃভূমি তাও গিয়েছে। ওর চোখের জল থামাবার তো হেতু নাই। সংসারে চোখের জল ছাড়া আর সকলেরই অন্ত আছে।

দর্জ্জি ও প্রেম

দর্জ্জি ও প্রেম শব্দ দুটি পাশাপাশি বসিলে হঠাৎ পরিহাস বলিয়া মনে হইতে পারে। সত্যই তো কোথায় দর্জ্জি আর কোথায় প্রেম! কোথায় ছোট্ট একখানি প্রায়ান্ধকার ঘরে বুড়ো দর্জ্জির মনোনিবেশ সহকারে জামা-কাপড় সীবন অধ্যবসায় আর কোথায় ভাবের আকাশে মুক্তপক্ষ প্রেমের অবাধ বিহার। এ দুয়ে যোগ কোথায়? কিন্তু প্রথম বিস্ময়ের ধাক্কা সামলাইয়া লইয়া আর একবার চিন্তা সুরু করিলে শব্দ দুইটির দুস্তর ব্যবধান কমিয়া আসিতে বাধ্য। রেলের লাইন দুটা সমান্তরাল রক্ষা করিয়া চলিতে চলিতে ষ্টেশনের কাছে আসিয়া জট পাকাইয়া যায় নাকি? তখন কোথায় থাকে মৌলিক দূরত্ব! দর্জ্জি ও প্রেমও তেমনি ঘটিয়া থাকে। দেখুন না কেন দর্জ্জি যে পোষাক তৈয়ারি করে তাহা প্রেমের একটি প্রধান উপাদান নয় কি? আগেকার কালে নরনারীর মিলন ঘটাইতে হইলে মদনকে ফুলবাণ নিক্ষেপ করিতে হইত। এখন এই দগ্ধ কলিকালে মদনের উপরে তেমন চাপ পড়ে না। মদনের বদলে বুড়ো মঈনুদ্দিন দর্জ্জি ফুলকাটা জামা নিক্ষেপ করে, দেখিতে দেখিতে বেশ জমিয়া ওঠে। ঐ বুড়ো মঈনুদ্দিন অঘটন ঘটনপটিয়সী প্রতিভার অধিকারী। জামার মাপ, গড়ন, ঢঙ, নকসা একটু এদিক-ওদিক করিয়া হয়কে নয়, নয়কে হয় করিতে সে সক্ষম। জামার গৌরবে পাড়ার ক্ষেন্তি বুড়ির বয়স দশ-বিশ বৎসর কমিয়া আসে। আবার জামার মাপের ও গড়নের হেরভেরে তন্বী তরুণীও প্রৌঢ় হইয়া দাঁড়ায়। ধন্য মঈনুদ্দিন বুড়ো। মঈনুদ্দিনের প্রতিভার ও ক্ষমতার

সামান্য একটু পরিচয় মাত্র দিলাম, এখন এই ধারায় চিন্তা করিয়া দেখুন, বুঝিতে পারিবেন যে দর্জ্জি ও প্রেমে কী আত্যন্তিক যোগাযোগ।

প্রমিতা ও পরমেশ অনাত্মীয় তরুণ তরুণী, ঘনিষ্ঠ তাহাদের পরিচয়। প্রমিতাই বা কে পরমেশই বা আসিল কোথা হইতে, কেমন করিয়া তাহাদের পরিচয় হইল, কোন সুযোগে তাহারা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিল এ সব অবান্তর তর্ক তুলিয়া গল্প মাটি করিবেন না। গল্প পড়িতে বসিলে ওসব স্বীকার করিয়া লইতে হয়, গল্পলেখকের মৌলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ বা প্রশ্নক্ষেপ চলে না। তাই বিনা সন্দেহে তাহাদের ঘনিষ্ঠতা স্বীকার করিয়া নিন, স্বীকার করিয়া নিন তাহাদের অবাধে ইচ্ছামত কলিকাতার পথে-ঘাটে বিচরণ করিয়া বেড়াইবার অধিকার।

প্রমিতার বাড়ীতে পরমেশ যখন খুশী যায় আর কাজের ছুতা করিয়া প্রমিতা তাহার সঙ্গে বাহির হইয়া যায়, কেহ এখন আর বড় প্রশ্ন করে না।

কখনো করিত কিনা?

সে কথায় আপনার প্রয়োজন কি, যাহা বলিতেছি শুনুন। খামোকা উৎসাহিত হইয়া উঠিবেন না, আপনার সঙ্গে প্রমিতা বাহির হইবে না, পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা আপনার নাই। কি দুঃখিত হইলেন? আমি বলি আপনি বাঁচিয়া গেলেন। কেন? তবে পরমেশকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিবেন।

প্রমিতার অনেক গুণের মধ্যে একটি দোষ এই যে ব্লাউসের গড়ন ও ঢঙ তাহার পছন্দ হয় না।

বড় বড় নামকরা দোকানগুলায় সে ঘুরিয়া দেখিয়াছে, একবারের জায়গায় তিনবার বদলাইয়া দেখিয়াছে—না, পছন্দ হয় না। হয় তো বা কাট্ আপটুডেট নয়, নয় তো সেলাই মজবুৎ নয়, নয় তো একটু কোণা বাহির হইয়া আছে। নাঃ এরা সব ফাঁকি দেয়, কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে করিয়া খাইতেছে।

প্রমিতা যখন ব্লাউসতত্ত্ব সম্বন্ধে দোকানদারকে বুঝাইয়া তাহার ভুল স্বীকার করাইতে তর্ক করে বেচারা পরমেশ তখন বোকার মত দাঁড়াইয়া থাকে। নাজেহাল দোকানদার নিরুপায় হইয়া পরমেশকে বলে, আপনিই বলুন স্যার কেমন হয়েছে?

পরমেশ অন্যদিকে হাত ঘুরাইয়া লয়, হয়তো একটা বিলিতি পুতুল সযত্নে নিরীক্ষণ করিতে থাকে—যেন ওটা দেখিতেই সে আসিয়াছে।

বিচক্ষণ দোকানদার পরমেশের অবস্থা বুঝিতে পারিয়া মনে মনে সমবেদনা জানায়।

নাঃ চলো এখানে হবে না।

দু'জনে বাহির হইয়া পড়ে।

শহরের বড় বড় সমস্ত জামার দোকান ফেল পড়িয়া গিয়াছে, প্রমিতার পছন্দমতো জিনিস জোগাইতে পারে নাই।

প্রমিতা বলে ছোট ছোট দোকানেই ওস্তাদ দর্জ্জি থাকে।

এই সূত্র অনুসরণ করিয়া এখন তাহাদের ছোট ছোট দোকান এবং ওস্তাদ দর্জ্জি অনুসন্ধান চলিতেছে!

ড্রাইভার রোখো রোখো।

ট্যাক্সি থামিল।

পরমেশ ঐ যে একটা দর্জ্জির দোকান।

নাঃ ওরা চিক তৈরী করে?

ওটা?

ওরা কার্পেট ধোলাই করে।

তবে ঐটে?

ও তো বরফের আড়ৎ।

চল ড্রাইভার। ট্যাক্সি চলে।

তাহাদের অনেকদিনের ছড়ানো অভিজ্ঞতা এক সঙ্গে গুছাইয়া বলিলাম। দর্জ্জির সন্ধানে তাহারা সারা শহর চষিয়া ফেলিয়াছে,

মনের মত দর্জ্জি মেলে নাই। কালের কী পরিবর্ত্তন দেখুন পুরাকালে মদন শিকার সন্ধান করিয়া ঘুরিত, আর এখন শিকার মদনের সন্ধান করিয়া বেড়ায়, তাও আবার মেলে না। মদনে ও মঈনুদ্দিন দর্জ্জিতে কিছু প্রভেদ আছে স্বীকার করিতেই হয়।

কলিকাতার এপ্রিল মাসের গরমে যখন সমস্ত শহর ঘরে আবদ্ধ তখন যে দুটি নর-নারীকে পথে ভ্রাম্যমাণ দেখা যায় তাহারা ঐ প্রমিতা ও পরমেশ।

দেখো সেবারে লাউডন ষ্ট্রীটে একটা দর্জ্জির দোকান দেখেছিলাম।

ট্যাক্সি লাউডন ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইলে দেখা গেল যে ভূতপূর্ব্ব দর্জ্জির দোকানের স্থানে নূতন সাততলা প্রকাণ্ড বাড়ী।

আচ্ছা, চলো তো ক্যামাক ষ্ট্রীট। থিয়েটার রোড আর ক্যামাক ষ্ট্রীটের মোড়ে পাশাপাশি দুটো দর্জ্জির দোকান ছিল।

ট্যাক্সি অকুস্থানে গিয়া দাঁড়াইলে দেখা গেল হাঁ দুটো দোকান পাশাপাশি আছে বটে, তবে একটা সিগারেটের আর একটা বরফের।

পরমেশ একবার মৃদুস্বরে আপত্তি জানাইয়া বলিয়াছিল যে তোমার শরীরটাই বে-ঢপ নইলে ব্লাউস ফিট করতে চায় না কেন।

তুমি চুপ করো তো। তোমাকে যখন সাহিত্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবো কথা বলো। যা জানো না—।

পরমেশ সেই হইতে জামা সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করে না, কেবল নীরব তৎপরতায় বাহকের কাজ করিয়া যায়।

নাঃ কলকাতা সহরের দর্জ্জিগুলো সব ফাঁকিবাজ, কিচ্ছু জানে না।

পরমেশ নিরুত্তর থাকে।

শুনেছি, লখ্‌নৌ শহরের দর্জ্জিরা সবচেয়ে এক্সপার্ট।

পরমেশ মনে মনে শঙ্কিত হইয়া ওঠে, তাহার তো ছুটি নাই।

বিকালবেলা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া তাহারা চৌরঙ্গীপাড়ার চায়ের দোকানে চা পান করে। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় যখন বাড়ী ফেরে তখন একসঙ্গে দক্ষিণা বাতাস, কোকিলের কুহু ও চাঁদের

ফালি প্রণয়ের আবহাওয়াটি দিব্য তৈয়ারি করিয়া তোলে। পুরাকালে এমন সুযোগ মদন ও নায়ক কখনো ছাড়িত না। কিন্তু কালের বদলে আমাদের নায়ক পরমেশ ভাবে কখন মেসে গিয়া শয্যাগ্রহণ করিতে পারিবে। আর কলিকালের মদন মঈনুদ্দিন দর্জ্জি যে কোথায় থাকে খুঁজিয়াও পাওয়া যায় না।

॥ দুই ॥

অবশেষে মনের মত দর্জ্জি মিলিল। তবে নামটা, মদন নয়, এমনকি মঈনুদ্দিনও নয়, হানিফ মিঞা। ছোট একটুখানি ঘর, প্রমিতা ও পরমেশ ঘরে ঢুকিতেই জায়গার টানাটানি হয়। ছোট একখানি টুলের উপরে দু'জনে পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে বসিল, মন্দ লাগিল না পরমেশের। ট্যাক্সির প্রশস্ত সীটে ইচ্ছা থাকিলেও এমন ঘনিষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়, এখানে না হইয়া উপায় নাই। একজনের গায়ের উত্তাপ অন্য জনের অঙ্গে সঞ্চারিত হইয়া যায়।

প্রমিতা বলে, তাড়াতাড়ি করো মিঞা।

পরমেশ গায়ের উত্তাপটুকু উপভোগ করিতে করিতে বলে, না না, ধীরে ধীরে করো—তাড়াতাড়িতে কাজ খারাপ হয়ে যাবে।

হানিফ মিঞা বলে, এ তো হয়েই গিয়েছে, আর এই একটুখানি।

প্রমিতা বলে, তা হলে কাল এসে নিয়ে যাবো।

হানিফ মিঞা বলে, আপনি আবার কষ্ট করে কেন আসতে যাবেন মা, সাহেব এসে বরঞ্চ নিয়ে যাবেন।

পরমেশ মনে পুলক অনুভব করে, ভাবে হানিফ মিঞার দূরদৃষ্টি আছে সন্দেহ নাই, (অবশ্য চোখে তার পুরু কাঁচের চশমা) সম্বন্ধটা ঠিক অনুমান করে নিয়েছে।

সে ভাবে আহা কবে ওর কথা সত্য হবে।

যখনি হোক, এখনি সে এক প্রকার গৌরব অনুভব করে, শুধু পুলক নয়। প্রেমিক শুধু পুলক অনুভব করে, স্বামী যুগপৎ পুলক ও গৌরব।

তবে তাই হবে, তুমি কাল এসে নিয়ে যেয়ো—বলে উঠে পড়ে প্রমিতা।

॥ তিন ॥

পরদিন শহরে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা বাধিয়া গেল। হিন্দু মুসলনানের ভয়ে, মুসলমান হিন্দুর ভয়ে পথে বাহির হওয়া বন্ধ করিল। পথঘাট জনশূন্য।

একাকী ঘরে বসিয়া প্রমিতা, তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে—যদি সত্যই পরমেশ এই বিপদের মধ্যে ব্লাউসটা আনিতে যায়—হানিফ মিঞার দোকান আবার সঙ্কটের এলাকায়।

প্রমিতা একবার ভাবে পরমেশ কখনো যাইবে না—সে কি আর শহরের খবর রাখে না।

আবার ভাবে হয় তো সত্যই গিয়াছে, লোকটা যে একগুঁয়ে।

ইতিমধ্যে হাজার বার সে ঘর-বাহির করিয়াছে, পদধ্বনি শুনিলেই চকিত হইয়া ছুটিয়া গিয়াছে। নাঃ পরমেশ নয়। অবশেষে উদ্বেগে আশঙ্কায় নিজের প্রতি ধিক্কারে সে ভাঙিয়া পড়িল, বালিশে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে থাকে সে। হায়, হায়, কেন সে নির্ব্বুদ্ধিতা করিল, কেন সে এমন পাড়ায় জামা তৈয়ারী করিতে দিল, না হয় জামার মাপ একটু-আধটু বেমানান-ই বা হইত।

বোধ করি সে একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, যখন জাগিল দেখিল দরজার সম্মুখে, হানিফ মিঞা নয়, রক্তাক্ত ছুরিকা হস্তে কোন গুণ্ডা নয়, ছোট একটি পুঁটুলি হাতে পরমেশ।

স্বপ্ন নয় তো !

সে ছুটিয়া কাছে গিয়া বলিল, পরমেশ শহরে দাঙ্গা হচ্ছে জানো না ?

জানি বই কি ! সেই জন্যেই ছুটে গিয়াছিলাম, পাছে হানিফ মিঞার দোকানঘর পুড়িয়ে দিলে জামাটা নষ্ট হয়ে যায়।

কেন এমন গোঁয়ার্ত্তুমি করতে গেলে ?

তুমি খুশী হবে ভেবে।

আমি খুশী হব ! তুমি কিচ্ছু বোঝ না। এই বলিয়া সে ঘরের দরজা বন্ধ করিতে উদ্যত হইল।

বাধা দিয়া 'পরমেশ বলিল, তার আগে একবার জামাটা দেখ।

দরকার নেই আমার।

পরমেশ শুনিল না, কাগজের মোড়ক খুলিয়া ফেলিল।

এ কি ! এটা কি ?

তাড়াতাড়িতে হানিফ মিঞা কার একটা ব্লাউস দিয়াছে। যেমন মাপ, তেমনি কাট্, তেমনি ছিটের বাহার !

ছিঃ এত কষ্ট করে শেষে এই ভুল জামাটা আনলাম।

না, কিছু ভুল হয়নি এই রকমটিই আমি চাইছিলাম !

কিছুক্ষণ পরে চায়ের টেবিলে সেই জামা পরিয়া প্রমিতা যখন দেখা দিল সকলে বলিল—এ কি ঢঙ জামার। এত খোঁজাখুঁজি করে অবশেষে এই জামা বানালে প্রমিতা।

প্রমিতা বলিল—খারাপটা কি ? তোমরা বুঝবে না—এ নূতন 'কাট্।'

মূঢ় পরমেশ মনে মনে ভাবিল স্ত্রীলোকের মতিগতি দেবা ন জানন্তি।

হানিফ মিঞা সত্যসত্যই মদনের ভূমিকা গ্রহণ করিল—এবং

তাহার কৃপাতেই দর্জ্জি ও প্রেমের মতো দুটি বিসদৃশ শব্দের মধ্যে সাম্যস্থাপন সম্ভব হইল।

হানিফ মিঞার আরো একটা ভবিষ্যদ্বাণী সফল হইয়াছে, পরমেশ এখন প্রমিতার সাহেব।

অবশ্য একটা প্রভেদও ঘটিয়াছে। প্রমিতাকে এখন একাকী জামা কিনিতে বাহির হইতে হয়—পরমেশ আর সঙ্গে যায় না। মদন ওরফে মঈনুদ্দিন বিবাহিত নরনারী সম্পর্কে উদাসীন আর সেই দৃষ্টান্তে বিবাহিত নরনারীও পরস্পরের সম্বন্ধে উদাসীন। তাহাদের মত নিঃসঙ্গ ব্যক্তি অল্পই আছে।

ছাপ সন্দেশ

॥ এক ॥

আর ছ্যা ছ্যা করকোষ্ঠীতে কিছু নেই। এযে নূতন কথা। হাতের আঁকজোকেই মানুষের ভবিষ্যৎ অঙ্কিত।

প্রমাণ ?

সার্বজনীন বিশ্বাস।

সার্বজনীন নয়, অনেকের বিশ্বাস। অনেকে বিশ্বাস করে বাসুকির ফণার উপরে পৃথিবী স্থাপিত। সেটা কি সত্য ?

কিন্তু 'চিরো'—সে বলেন।

'চিরো' নয়—'কাইরো', ওটা একটা ছদ্মনাম, গ্রীক 'কাইরো' শব্দ সংস্কৃত 'করা' শব্দ ছাড়া আর কিছু নয়।

শব্দতত্ত্বের জ্ঞানটুকু স্বীকার করলেও বাকিটুকু স্বীকার করতে পারলাম না। তখন প্রসঙ্গ বদলে বললাম। জ্যোতিষ শাস্ত্র, গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব এগুলোও কি বাজে ?

বন্ধু অনেকখানি সিগারেটের ধোঁয়া মুখের মধ্যে টেনে নিয়ে ধীরে ধীরে ঘরের কড়িকাটের দিকে অনেকগুলো ধোঁয়ার বলয় নির্গত করে দিয়ে চুপ করে রইলেন।

তাঁর মৌন দেখে বললাম, কি 'মৌনং সম্মতি লক্ষণং' নাকি ? স্বীকার করতে হল তো।

মোটেই নয়।

তবে ?

ঐতো বল্‌লাম।

শুনতে পেলাম না কেন ?

দেখতে অবশ্যই পেয়েছেন আমার উত্তর ঐ ধোঁয়ার কুণ্ডলী। জ্যোতিষ শাস্ত্র সব ধোঁয়া, সব বাজে।

তারপরে, ইতিমধ্যে তাঁর কথায় সারগ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছি, ভেবে বললেন—সূর্য চন্দ্রের প্রভাব মানুষের ভাগ্যের উপরে কি ভাবে সম্ভব?

পরিজ্ঞাত উদাহরণগুলো প্রয়োগ করলাম। কেন, সূর্যের আলোয় যদি ফুল ফোটে, চাঁদের টানে যদি সমুদ্রে জোয়ার জাগে, তবে—

বন্ধু, মানুষ ফুলও নয়, সমুদ্রও নয়।

মেঘ দেখে তবে ময়ূর নাচে কেন?

সে কথা ময়ূরকে জিজ্ঞাসা করা হোক। খুব সম্ভব আর একটা ময়ূর ভাবে।

তবেই তো প্রমাণ হলো দূর থেকেও প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব।

কে বলেছে সম্ভব নয়? অসম্ভব হলে বেতার জিনিসটাই মিথ্যা হতো।

এবারে কথার প্রসঙ্গ বদলালাম—বললাম, ভৃগু?

বোগাস।

বলছেন কি, তিনি যে ঋষি, ত্রিকালদর্শী।

সেটাই তো প্রমাণের বিষয়।

নাঃ এমন লোকের সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব। ভৃগু মানে না, জ্যোতিষ মানে না, করকোষ্ঠী মানে না, হয়তো এরপরে বলে বসবে পরকাল, ভগবান কিছুই মানিনে।

এরপরে বলবেন যে আমি নিশ্চয় পরকাল ও ভগবানও মানি নে।

বুঝলেন কি করে?

এইরকম অবস্থায় পড়ে অনেকে ঐ সব কথা বলেছে কিনা।

তবে কি মানেন?

অনেক কিছু মানি যেমন এই আপনাকে মানি, আমাকে মানি, এমনি আরো কত কি মানি।

মানুষকে মানেন আর মানুষের অদৃষ্ট মানেন না।

অবশ্যই মানি।

তার মানে অদৃষ্ট মানেন অথচ তা জানতে পারা যায় না এই বলতে চান।

অবশ্যই জানতে পারা যায়।

বিস্ময়ে প্রায় লাফিয়ে উঠে বললাম, তবে এতক্ষণ তর্ক করছিলেন কেন?

এইজন্যেই জ্যোতিষ, ভৃগুতে, করকোষ্ঠীতে জানা যায় না।

তবে আর কি উপায় আছে?

মুখকোষ্ঠী; কিনা মুখের ছাপ।

সেটা আবার কি?

মুখমণ্ডলের ছাপে যে সংবাদ লিখিত থাকে তাই।

নূতন শুনলাম।

পৃথিবী যে গোলাকার এ কথাটাও একদিন নূতন শুনেছিলেন তাই বলে নিশ্চয় মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় নি।

খুলেই বলুন শুনি।

তবে শুনুন বলে তিনি আরম্ভ করলেন।

কিন্তু আরম্ভেরও আগে আরম্ভ আছে, সন্ধ্যাবেলায় প্রদীপ জ্বালাবার আগে সকালবেলায় সলতে পাকানো বলে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করবার পর থেকে সকল লেখকই এখন প্রদীপ জ্বালাবার উদ্দেশ্যে সলতে পাকাতে সুরু করেছেন, আরম্ভের আগে আরম্ভটা দেখিয়ে দিতে চান। কাজেই যুগধর্ম অনুসরণ করে আমাদের সলতে পাকাতে হবে, সন্ধ্যাপ্রদীপের তেল জুটুক আর নাই জুটুক।

আমার বন্ধুটি অর্থাৎ রমেশবাবু একসময়ে জীবনবীমার দালাল ছিলেন, এখন মোটর গাড়ি কেনা-বেচার কাজ করেন। অনেকগুলো মোটরগাড়ি সদা-সর্বদা তার হাঁকডাকের মধ্যে থাকে। ময়রা

মিষ্টি না খেতে পারে, গ্রন্থকার গ্রন্থ (অপরের) না পড়তে পারে, শিক্ষক শিক্ষকতা না করতে পারে তাই বলে মোটর ব্যবসায়ী মোটরে চড়বে না এ কথা সত্য নয়। রমেশবাবুকে কখনো পায়ে হাঁটতে দেখিনি, বাড়ির মধ্যে ছাড়া। তাঁর সাহচর্যে সুলভ মোটরে যাতায়াত আমার অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যাবেলায় কর্মস্থল থেকে দু'জনে একসঙ্গে (অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে) বাড়ি ফিরতাম। এই অভ্যাসটা যে কেবল 'বন্ধনহীন গ্রন্থী' নয় তা প্রমাণ করবার জন্যে মাঝে মাঝে যেতাম তাঁর বাড়িতে। একদিন এইরকম এক অবসরে কথায় কথায় পূর্বোক্তি তর্ক উঠে পড়ে। এই পর্যন্ত হল গিয়ে সলতে পাকানো। এবার চেষ্টা করা যাক প্রদীপ জ্বালাতে।

বন্ধুটি আরম্ভ করলেন—মুখের ছাপ দেখে যে মানুষের স্বভাব-চরিত্র আর ভবিষ্যৎ বলতে পারা যায় তা আগে বিশ্বাস করতাম না। কিন্তু জীবনবীমায় দালালি করতে গিয়ে বুঝলাম ব্যাপারটা শুধু সত্য নয়—রীতিমতো সায়ান্স। তখন থেকে মানুষ চরাতে চরাতে এই সায়ান্সে হাত পাকিয়েছি—এখন অচেনা মানুষ দেখামাত্র তার ভূত ভবিষ্যৎ পেশা স্বভাব চরিত্র মতিগতি সব বলে দিতে পারি। মোটরে চলেছি পাশের মোটরের মানুষটাকে দেখে কতবার ভয়ে শিউরে উঠেছি, আস্ত খুনে, কিংবা ব্যাঙ্ক-মার কিংবা ডাকাত! উঃ লোকটা কি নিষ্ঠুর হৃদয়হীন পাষণ্ড বলেছি নিজেকে। অবশ্য দয়ালু সর্বত্যাগী লোকও চোখে পড়েছে—তবে তুলনায় কম।

আমি বললাম, আপনার ক্ষমতায় মোটেই ঈর্ষাবোধ করছি না, কেন না অধিকাংশ সময়ে আপনাকে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকতে হয়।

তিনি বললেন, এটা বোধ হয় ঠাট্টা হল।

আদৌ নয়—আপনার বিজ্ঞানে ও ক্ষমতায় আমি বিশ্বাসী, আর ইতিমধ্যেই খানিকটা আয়ত্ত করে ফেলেছি।

সন্ধিগ্ধ বিশ্বাসে তিনি বললেন, কেমন ?

এই যেমন আপনার মুখ দেখে বুঝলাম আপনার কন্যার বিবাহ আসন্ন।

হো হো করে উঠ্‌লেন রমেশবাবু।

শুধু আসন্ন নয় আগামীকাল বেয়াই আসবে মেয়ে দেখতে।

ঘর বর কেমন?

ভালো বলেই তো মনে হচ্ছে।

বেয়াই লোকটি কেমন?

এখনো তাকে চোখে দেখি নি, শুধু দাবি জেনেছি।

দাবি খুব বেশী কি?

ডাকাতি করে নিলেও ওর চেয়ে বেশী হতে পারতো না।

তারপর বললেন, ওসব দুঃখের কথা থাক, আগামীকাল আপনাকে উপস্থিত থাকতে হবে মেয়ে দেখবার সময়।

অবশ্যই থাকবো। আজ তবে উঠি।

রমেশবাবু দরজা পর্যন্ত এসে বললেন, কালকে বেলা থাকতে থাকতে ফিরতে হবে, তৈরী হয়ে থাকবেন।

আচ্ছা, ভুল হবে না বলে বিদায় নিলাম।

॥ দুই ॥

রমেশবাবুর সঙ্গে মোটরে তাঁর বাড়িতে চলেছি। আজ বেলা থাকতেই রওনা হয়েছি, অন্যদিন অন্ধকার হয়ে যায়। পাশাপাশি অনেকগুলো মোটরের সার, কখনো এগোচ্ছে, কখনো আলোর বা পুলিসের সঙ্কেতে থামছে। এদিকে ওদিকে দু'খানা মোটরের আরোহীদের বেশ দেখতে পাওয়া যায়।

আমি বললাম, এইভাবে মোটরে চলতে চলতে মানুষের মুখের ছাপ স্টাডি করবার প্রশস্ত সুযোগ।

ঠিক বলেছেন, অভ্যাস থেকেই আমার মুখজ্যোতিষ স্টাডি আরম্ভ হয়। আলোর সঙ্কেতে দাঁড়িয়ে আছি, বিরক্তি লাগছে, তখন এই রকম একটা hobby থাকলে সময় কাটে বেশ। সময় কাটাতে গিয়ে একটা সায়ান্স গড়ে তুলেছি—

এই পর্যন্ত বলেই তিনি চমকে উঠ্‌লেন, কি পাষণ্ড নিষ্ঠুর লোকটা! নিশ্চয় ব্যাঙ্ক-মার বা ঐরকম একটা কিছু!

কে মশাই?

কনুইয়ের গুঁতো দিয়ে পাশের ট্যাক্সিখানার আরোহীর দিকে ইঙ্গিত করে বললেন—দেখছেন লোকটাকে?

নিরীহ ভদ্রলোক বলেই মনে হচ্ছে।

নিরীহ ভদ্রলোক! আরে ঐতো ওঁর asset! ঐ নিরীহতা দিয়ে ভুলিয়ে কত লোকের যে সর্বনাশ করেছে তার ঠিক নেই।

মিছা দোষারোপ করছেন এক ভদ্রলোকের উপরে।

রমেশবাবু বললেন, বিখ্যাত মার্কিন দস্যু Al Capon-এর চিবুক দেখেছেন।

Al Capon-কেই দেখিনি, তার আবার চিবুক।

এই ভদ্রলোকের চিবুক তার চেয়ের মারাত্মক; নৃশংসতা ও অর্থলোলুপতা প্রত্যেক পেশীতে অঙ্কিত।

আবার সকলে এগোচ্ছি—ট্যাক্সিখানা এগিয়ে গেল।

দাঁড়ান আবার ট্যাক্সিখানার পাশে যেতে পারলে আরও একটু লক্ষ্য করবো।

এমন অবস্থায় রাস্তায় যেমন হয়, কখনো চিহ্নিত গাড়ি পাশাপাশি এসে পড়ে, কখনো এগিয়ে যায়, কখনো পিছিয়ে পড়ে। এবারে আবার পাশাপাশি এসে পড়েছি।

আমাকে ঠেলা মেরে বললেন, চট করে ভদ্রলোকের চোখদুটো লক্ষ্য করুন।

এমন তো কিছু দেখছি নে।

আপনি তো এ শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ, কেবল করকোষ্ঠী, ভৃগু আর গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে কাটিয়েছেন। ইস্ চোখের কী সিন্দুক-ভেদী দৃষ্টি! আপনার সিন্দুকে কত টাকা আছে অদৃশ্য-রশ্মিতে দেখছে ঐ চোখ, আর চিবুক দিচ্ছে সেই টাকা হরণ করায় উৎসাহ। ঠোঁট দুটো দেখুন।

আমি বললাম, পাতলা আর চাপা।

ঐ রকম ঠোঁট ছিল আফজল খাঁর, মারাঠা হিস্ট্রি ছিল আমার স্পেশ্যাল পেপার।

ঠোঁটের বক্তব্য কি?

ঐ ঠোঁট খুন করতে, রাহাজানি করতে, ব্যাঙ্ক ভাঙতে এতটুকু দ্বিধাবোধ করবে না।

আবার এগিয়ে গেল ট্যাক্সিখানা।

আমি বললাম, এ সমস্তই তো একতরফা হচ্ছে, বাস্তবের সঙ্গে মিল না থাকতে পারে।

থাকবেই মিল। বহুদিনের পরীক্ষিত সত্য। তবে যদি আপনার বিশ্বাস না হয়—ঐ দেখা যাচ্ছে ট্যাক্সির নম্বর, টুকে নিন! তারপরে ভদ্রলোককে অনুসরণ করে গিয়ে আলাপ করুন। কিন্তু মশাই টাকা পয়সা খোয়া গেলে আমাকে দোষ দিতে পারবেন না।

আবার আমরা চলেছি ট্যাক্সির পাশাপাশি। হঠাৎ ঝাঁকুনি খেল ট্যাক্সিখানা আর ঝুঁকে পড়বার ফলে দেখা গেল ভদ্রলোকটির পাশে উপবিষ্ট মহিলাটিকে।

রমেশবাবু বলে উঠলেন, সর্বনাশ! এ যে সস্ত্রীক চিনে ডাকাত।

কেমন?

ঐ মহিলাটি খুব সম্ভব ওঁর স্ত্রী। উঃ একেবারে ক্ষুদিত পাষাণ।

খুলে বলুন।

খুলে বলবার আর আছে কি। মাণিকজোড়টি। ভদ্রলোকটির মধ্যে লোভ আর নৃশংসতার যদি কিছু ফাঁক থাকে তা পূরণ করে দিয়েছেন উনি।

কি দেখে বুঝলেন, চোখ না চিবুক না ঠোঁট ?

নাক, নাক, মেয়েদের মুখের ছাপ সবচেয়ে স্পষ্ট ! দেখেছেন নাকটা, যেন ঠোকর মারবার জন্যে উদ্যত হয়ে রয়েছে।

আমি তাঁর শাস্ত্র স্টাডি করবার চেষ্টা করছি এমন সময়ে বলে উঠলেন, জোড় চলেছেন আজ না জানি কার কি সর্বনাশ ঘটবে।

কারো যে সর্বনাশ করে ফিরছেন না তা বুঝলেন কি করে ?

মুখ-চোখের ক্ষুধিত ভাব দেখে বুঝছি, খাদ্যের সন্ধানে চলেছেন !

শার্লক হোমসের শাগরেদ ওয়াটসনের মতো বুদ্ধি দেখাবার উদ্দেশ্যে বললাম, আর তা ছাড়া তখন নিশ্চয় দু'জন এক ট্যাক্সিতেও ফিরবেন না।

না, না, সে সতর্কতার প্রয়োজন নেই। এঁরা তো প্রকাশ্যে খুন ডাকাতি করবেন না।

তবে ?

এঁরা হচ্ছেন ভদ্রবেশী ডাকাত। ভুলিয়ে-ভালিয়ে আইনের মুখোশ বজায় রেখে এঁরা পরস্ব হরণ করেন। হয়তো যে ব্যাঙ্ক আগামীকাল ফেল পড়বে, চড়া সুদের লোভ দেখিয়ে আপনার টাকা নিয়ে গিয়ে জমা দিলেন আজকে। এঁরা জেলের বাইরে থাকেন বলেই সংসারটা এমন বিপদ্‌জনক। সর্বদা এঁদের এড়িয়ে চলবেন মশাই।

আপনি ?

আমি ? শতহস্ত দূরে থাকি মশাই—শত হস্ত দূরে থাকি। এই সায়ান্সটা আয়ত্ত হওয়ার পর থেকে ওদের আক্রমণ এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছি।

ট্যাক্সিখানা হু হু করে এগিয়ে চলে গেল। রমেশবাবু বললেন, চলুন কিছু ভালো সন্দেশ নিয়ে যাওয়া যাক—বেয়াই—

আমার সময়োচিত আর কিছু মনে না আসায় বললাম, নিশ্চয়ই 'মিষ্টান্নং ইতরে জনাঃ।'

নিজের রসিকতায় নিজে অপ্রস্তুত হয়ে বল্‌লাম, কিছু মনে করবেন না রমেশবাবু, আপনার কুটুম্বদের ইতর জন বলিনি।

রমেশবাবুর বাড়িতে পৌঁছবামাত্র তাঁর ছোট ছেলেটি দৌড়ে এসে বলল, বাবা ওরা এসেছেন দিদিকে দেখতে।

চল্‌ যাই ভিতরে।

বৈঠকখানায় ঢুকেই চমকে উঠ্‌লাম—ট্যাক্সির সেই ভদ্রলোকটি।

তিনি সহাস্যে দাঁড়িয়ে উঠে নমস্কার করে বললেন, সঙ্গে আমার স্ত্রীও এসেছেন ভিতরে গিয়েছেন।

চট করে একবার রমেশবাবুর মুখ দেখেছিলাম, তাতে এই মুহূর্তে যে ছাপ ফুটে উঠেছে তা অবশ্যই স্টাডি করবার মতো।

তারপরে ভাবলাম রমেশবাবুর 'সায়ান্স' শেষ পর্যন্ত হয়তো মিথ্যা না হতেও পারে, বেয়াই-বেয়ান তো।

রাধারানী

(এ যুগের কলমে সে যুগের কাহিনী)

মাহেশের রথের মেলায় রাধারানী নামে একটা ছোট মেয়ে, বয়স খুব বেশী হবেত এগারো, গিয়েছিলো। রথের মেলাতে লোকে রথ দেখতে যায় আবার বেচতেও যায়। আমাদের রাধারানী গিয়েছিল বেচতে। অতটুকু ছোট মেয়ে সে আবার কি বেচবে? তাহলে রাধারানীর ইতিহাস বলতে হয়, নইলে কেমন করে বোঝাবো যে কেন সে এই অল্প বয়সে বেচতে গিয়েছিল রথের মেলায়।

রাধারানীরা নিতান্ত দরিদ্র। সংসারে সে আর তার বিধবা মা। মার আজ তিনদিন জ্বর। মা বলে ভালই হলো খাওয়ার বালাই নেই। রাধারানীর আজ সারাদিন খাওয়া হয় নি। সে বলে ভালই হলো রান্নার বালাই নেই। কিন্তু আগামী কাল কি হবে? ও চিন্তা ধনী দরিদ্র ছোট বড় সকলেরই, আমাদের ছোট্ট রাধারানীরও। তখন ছোট্ট রাধারানী মস্ত একটা বুদ্ধি ঠাওরালো, বিকেলবেলায় বনফুলের একটা মালা গেঁথে মাহেশ বলে রওনা হলো, রথের মেলায় বেচে গোটা দুই পয়সা পেলে মার জন্য পথ্য কিনবে। আমাদের রাধারানী খুব বুদ্ধিমতী।

কিন্তু বিধি আজ রাধারানীর প্রতি বড় বাম। সে যখন মেলায় পৌঁছল তখন অঝোরে বৃষ্টি হচ্ছে, দোকানীরা ঝাঁপ ফেলে বসে আছে। লোকজন মাথা বাঁচাবার জন্য এদিক ওদিক আশ্রয় নিয়েছে। বনফুলের মালার খদ্দের কোথায়? মাঝে একবার বৃষ্টি থামতে রাধারানীর আশা হল এবার লোক জুটবে, কিন্তু তখনই আবার চেপে বৃষ্টির এলো, সেই সঙ্গে নামলো সন্ধ্যা। রথের মেলা ভেঙে গেল। এতবড় সংসারে রাধারানীর বনফুলের মালার খদ্দের পাওয়া গেল না।

অগত্যা রাধারানী বাড়ীর দিকে ফিরলো। তার শাড়ী থেকে জল পড়ছে, চুল থেকে জল পড়ছে, চোখ থেকে জল পড়ছে। এমন নৈরাশ্য সত্বেও সে বনফুলের মালাটা ফেলে দেয়নি, সযত্নে আঁচলের তলায় রেখে দিয়েছিল। আগেই বলেছি আমাদের রাধারাণী খুব বুদ্ধিমতী। সে নিজে ছোট কিন্তু বুদ্ধিটা ছোট নয়।

এমন সময় অন্ধকারে পা পিছলে পড়ে গিয়ে সে কেঁদে উঠলো, কাছাকাছি লোক আছে জানলে জোরে কাঁদতো না। কিন্তু এই অন্ধকারে এমন বৃষ্টিতে কে আর থাকবে কাছে—সেই ভরসায় মাগো বলে কেঁদে উঠলো সে।

—কে কাঁদে গা?

—আমি দুঃখিনী।

—কি তোমার নাম?

—রাধারানী।

—অন্ধকারে তোমাকে দেখতে পাচ্ছিনে, তোমার বয়স কত?

—এগার।

এমন সময় একবার বিদ্যুৎ চমকালো। প্রশ্নকর্তা দেখলো, সত্যই মেয়েটি নিতান্ত বালিকা। এমন সময় এমন স্থানে এই বালিকাকে দেখে আগন্তুকের বড় দয়া হল। সে বলল—রাধারানী, তুমি পড়ে যাবে আমার হাত ধরো।

—রথের মেলায় কেন গিয়েছিলে রাধারানী?

—বনফুলের মালা বেচতে।

—বলকি! আমিত ফুলের মালাই খোঁজ করছিলাম মেলাতে। এমন সময় মেলা ভেঙে গেল। আমি কিনবো তোমার মালা। কত দাম?

—দুই পয়সা।

রাধারানীর দুঃখের দিনের কথা শুনিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। যে সব

আপনাদের অজানা নয়। যেটুকু তিনি বলেননি বা সংক্ষেপে বলেছেন সেটুকু বলবার ভার আমার উপরে অর্থাৎ মূলে যা ছিল বঙ্কিম, তা করতে চেষ্টা করবো সরল।

তাহলেও একবার মনে করিয়ে দেওয়া উচিত যে রাধারাণীকে কুটীরে পৌছে দিয়ে, ছুটো ডবলপয়সা বলে ছুটো টাকা দিয়ে, অন্ধকারে একশো টাকার একখানা নোট গুঁজে দিয়ে, দোকানীর হাতে শাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে আর নিজের নাম রুক্মিণীকুমার জানিয়ে দিয়ে আগন্তুক নিলো বিদায়। বঙ্কিমের কলম থেকে আপনারা জেনেছেন সে সব ঘটনা। এবার শুনুন বঙ্কিম যা বলেননি বা নিতান্ত আভাসে বলেছেন।

॥ ছুই ॥

গঙ্গার ঘাটে বজরায় ফিরে গিয়ে রুক্মিণীকুমার দেখলেন একজন কর্মচারী বসে আছে। সে প্রভুকে অভিবাদন করে জানালো যে—হুজুর কাশী থেকে জরুরী তার এসেছে।

বাবার খবর—শুধালেন রুক্মিণীকুমার।

হ্যাঁ, রাজাবাহাছুর গুরুতর পীড়িত, আপনাকে অবিলম্বে রওনা হতে বলেছেন। রুক্মিণীকুমার উদ্বিগ্ন হয়ে উঠে বললেন, তবে আমি স্টেশনে চললাম। প্রথমে যে গাড়ী পাই তাতেই রওনা হয়ে যাবো। তুমি বজরার সঙ্গে বাড়ী চলে যাও। সেই রাত্রেই রুক্মিণীকুমার কাশী রওনা হয়ে গেলেন।

বজরায় ফিরবার সময়ে তিনি স্থির করেছিলেন যে ভোর বেলা বালিকাটির কুটীরে গিয়ে তাদের অবস্থাটা ভালো করে জেনে নেবেন—আর তাদের ভরণপোষণের সুবন্দোবস্ত করবেন। কিন্তু ঘটনাচক্রের অপ্রত্যাশিত হস্তক্ষেপে তা আর হয়ে উঠল না। তবু

তিনি মনে আশা রাখলেন যত সত্বর কাশী থেকে ফিরে এসে রাধারানীকে দারিদ্র্য থেকে উদ্ধার করবেন। কদিন বিলম্বে আর এমন কি ক্ষতি হবে। একবারের সাক্ষাতেই রাধারানী তার মনে স্থান করে নিয়েছিল—রাধারানী শুধু বুদ্ধিমতী না—লক্ষ্মী মেয়েও বটে। রুক্মিণীকুমার পকেটে হাত দিয়ে দেখলেন সেই বনফুলের মালাটি আছে। বনফুলের মালা, রাধারানী, পিতার গুরুতর ব্যাধির সংবাদ—সাত পাঁচ চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এবারে একটা রহস্য পরিষ্কার করে নেই। ভদ্রলোকটির আসল নাম দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়, রুক্মিণীকুমার ছদ্মনাম। মানী লোককে অনেক সময় ছদ্মনাম ধারণ করতে হয়। দেবেন্দ্রনারায়ণকে মানী লোক বলতে হয় বইকি—তাঁর পিতা হচ্ছেন রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ রায় বাহাদুর।

দেবেন্দ্রনারায়ণ দেখলেন যে পিতার ব্যাধি গুরুতর হলেও এখন-তখন নয়।

রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ বললেন, দেবেন্দ্র, তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম, আমার সময় হয়ে এসেছে, আজ না হলেও দুদিন বাদে হবে। আর আগে তোমাকে একটা অনুরোধ আছে।

অনুরোধ বলছেন কেন বাবা, আদেশ বলুন।

তবে তাই মনে কর।

তখন তিনি সুরু করলেন—বউমা গত হবার পরে সাত বছর হল, আমি যাওয়ার আগে তোমাকে সংসারী দেখতে চাই।

দেবেন্দ্রনারায়ণের মৌনকে সম্মতি মনে করে তিনি আবার সুরু করলেন, আমার বাল্যবন্ধু সুরেন্দ্র সিংহের সম্প্রতি মৃত্যু হয়েছে। তার একমাত্র সন্তান মাধবীলতার বয়স ষোল। তাকে তুমি পত্নীরূপে গ্রহণ কর। সুরেন্দ্র আর আমার দুজনেরই এই

ইচ্ছা ছিল, ইতিমধ্যে আমি কাল ব্যাধিতে পড়লাম—আর সুরেন্দ্রের হঠাৎ কাল পূর্ণ হল। এখন তুমি আমাদের অন্তিম ইচ্ছা রক্ষা কর।

দেবেন্দ্র বললেন, আমি কবে আপনার অবাধ্য, আপনাদের আদেশ অবশ্যই পালন করবো।

রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ বললেন—যাক আমি নিশ্চিত হলাম—আর মাধবীলতার বিষয়-আশয় নিয়ে যে জটিল মামলা চলছে তারও একটা সুব্যবস্থা হবে।

পরে নিজের কথা ব্যাখ্যা করে বললেন, সুরেন্দ্রের জ্ঞাতির সঙ্গে মস্ত একটা সম্পত্তি নিয়ে হাইকোর্টে মামলা চলছে, সুরেন্দ্র যতদিন ছিল চিন্তার কারণ ছিল না কিন্তু অতটুকু মাধবীলতা মামলা মোকদ্দমার কি বোঝে! এবারে তোমার হাতে সে পড়লো—সম্পত্তিটা উদ্ধার হবে।

দেবেন্দ্র বললেন, যে সব কথা এখন যাক। আপনি নিশ্চিন্ত হোন।

তারপরে কয়েক দিনের মধ্যে কাশীতেই মাধবীলতার সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল দেবেন্দ্রনারায়ণের। আর তার কয়েক দিন পরেই নিশ্চিন্ত মনে রুদ্রেন্দ্রনারায়ণ কাশী লাভ করলেন।

এবারে একটু মাঝখানের কথা বলে নেই। সুরেন্দ্রনারায়ণ ও বলেন্দ্রনারায়ণ সিংহ জ্ঞাতি ভ্রাতা। সম্পত্তি নিয়ে মামলা এদের মধ্যেই। বলেন্দ্রনারায়ণ বছর কয়েক আগেই মারা গিয়েছেন—আর সুরেন্দ্রনারায়ণ সম্প্রতি মৃত। বলেন্দ্রনারায়ণের একমাত্র সন্তান ও উত্তরাধিকারী সেই ছোট্ট মেয়ে রাধারানী। ওদের নিবাস রাজপুর গ্রাম। পিতার মৃত্যুর পরে সম্পত্তি হস্তচ্যুত হওয়ায় রাধারানীর মা দরিদ্র হয়ে নিজ গ্রামে থাকতে রাজী হলেন না, তিনি শ্রীরামপুরে এসে নিতান্ত দারিদ্র্যের মধ্যে মেয়েকে নিয়ে বাস করতে লাগলেন।

এক ভরসা হাইকোর্ট যদি তাঁর পক্ষে রায় দেয়। তাঁর উকিল কামাখ্যাবাবু ভরসা দিয়েছিলেন যে হাইকোর্টে জিত হবে।

ঘটনাচক্রে রুক্মিণীকুমার ওরফে দেবেন্দ্রনারায়ণ রাধারানীর জ্ঞাতি ভগ্নী মাধবীলতাকে বিবাহ করলেন—আর তার সম্পত্তির মালিক হয়ে রাধারানীর বিরুদ্ধে হাইকোর্টে লড়তে লাগলেন। কিন্তু এসব কথার কিছুই তিনি জানতে পারলেন না—আদালতের নথীপত্রে তো রাধারানীর নাম থাকবার কথা নয়। কিন্তু নথীপত্রে না থাকুক—দেবেন্দ্রনারায়ণের মনের মধ্যে রাধারানীর নামটা রয়ে গেল—আর রয়ে গেল সেই বনফুলের মালাটা দেরাজের মধ্যে—মালাটা শুকিয়েছে কিন্তু তার গন্ধ যায়নি।

একদিন মাধবীলতা তাদের পরিবারের পুরনো ফোটোগ্রাফগুলি দেখাচ্ছিল দেবেন্দ্রকে। একটী ছোট মেয়ের ফোটোগ্রাফ দেখে দেবেন্দ্র চম্‌কে উঠে জিজ্ঞাসা করলো—এ মেয়েটী কে?

মাধবী বল্‌লো—এতো রাধারানী।

আনন্দিত বিস্ময়ে বলে দেবেন্দ্র—রাধারানী! রাধারানী! কোন্ রাধারানী!

চেন নাকি কোন রাধারানীকে!

নিজেকে সামলে নিয়ে দেবেন্দ্র বলে, না, কে এ?

এ আমার জ্ঞাতি বোন্। যাদের সঙ্গে বিষয় নিয়ে মামলা চল্‌ছে, রাধারানী সেই বাড়ির মেয়ে।

তারপর দেবেন্দ্রর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলে—রাধারানীর বাবা আর আমার বাবা ছিলেন জ্ঞাতি ভাই। সম্বন্ধে রাধারানীর বাবা আমার খুড়ো। তাঁর মৃত্যুর পরে নীচের আদালতের হুকুমে আমরা দখল পাই তাদের সম্পত্তির। তখন ওরা পৈতৃক নিবাস রাজপুর ছেড়ে চলে যায় শ্রীরামপুরে না কোথায়। তারপরে কি হল আর জানিনে। শুনেছি খুব কষ্টে দিন কাটাচ্ছে ওরা। বাল্যকালে দুজনে একসঙ্গে খেলাধূলা করেছি —সেই সময়ের ছবি ওখানা।

দেবেন্দ্রর আর সংশয় থাকে না যে এই রাধারানী সেই মাহেশের বনফুল-বিক্রেতা রাধারানী।

দেবেন্দ্রর সারাদিন কি ভাবে অতিবাহিত হল একমাত্র সেই জানে আর জানেন তিনি মানুষের মনের খবর যিনি রাখেন। দেবেন্দ্র ভাবে দেবতার কি নির্দয় বিধান—রাধারানী আজ গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য বনফুলের মালা বিক্রয় করছে—আর তিনি দেবেন্দ্রনারায়ণ তার সম্পত্তির উপরে অধিকার লাভের জন্য করছেন মাম্‌লা! হায় ভগবান! মামলায় তার রুচি চলে যায়।

হাইকোর্টের রায় আনুকূল্য করে রাধারানীকে। সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার হুকুম পেলো সে।

দেবেন্দ্রর উকিল বল্‌লো ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। বিলাতে সুপ্রীম কোর্টে আপীল করতে হবে।

বিস্তর খরচ—তার চেয়েও বেশী হাঙ্গামা—না ওর মধ্যে যাবো না।

মাধবীলতা কি বল্‌লো?

সে আর কি বলবে? এ সব বিষয় সে কি বোঝে? স্বামীর মতেই তার মত। তা ছাড়া তার তো অভাব নেই।

দেবেন্দ্র মনে মনে খুশী হল—রাধারাণীকে আর বনফুলের মালা বিক্রয় করতে হবে না।

॥ তিন ॥

এবারে রাধারানীর দিকের কথা বলি। কিছুদিন দুঃখ কষ্টের মধ্যে থাকবার পরে সম্পত্তি ফিরে পেলো তারা। তারা আবার ফিরে এলো রাজপুরে। তখন তার মা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো মেয়ের বিয়ের জন্যে। টাকা যখন আছে বরের অভাব হল না। হাইকোর্টের এক উকিলের সঙ্গে হল রাধারানীর বিয়ে।

ইতিমধ্যে রাধারানীর মার মৃত্যু হল। রাধারানী চলে এলো কলকাতায় স্বামীর বাড়ীতে।

সেদিনের বনফুলের মালার ক্রেতাকে, সহৃদয় রুক্মিণীকুমারকে কি কখনো মনে পড়তো রাধারানীর?

কেমন করে জান্‌বো স্ত্রীলোকের মন নাকি দেবতাদেরও অজ্ঞাত।

কলকাতার একটী বিখ্যাত চিত্রপ্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিল মাধবীলতা আর দেবেন্দ্রনারায়ণ। ভিড় ঠেলে ছবি দেখে বেড়াচ্ছে এমন সময়ে মাধবালতা অদূরবর্তী একটী মেয়েকে গিয়ে ধরলো— রাধারানী! রাধারানী আনন্দে বলে উঠ্‌লো—মাধবীদিদি তুমি! বহুকাল পরে দুইজনে দেখা!

রাধারানী একটি সুবেশ যুবককে কাছে ডেকে মাধবীলতার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল—মাধবীদিদি, ইনি আমার উনি।

প্রণাম দিদি—বললো রাধারানীর স্বামী। তখন মাধবীলতা বললো —দাঁড়াও আমার উনির সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিই।

এতক্ষণ দেবেন্দ্রনারায়ণ ছবি দেখ্‌ছিল, এসব ঘটনা ওর চোখে পড়েনি। মাধবী তাকে নিয়ে এসে পরিচয় করিয়ে দিল—এই দেখ রাধারানী যার ছবি সেদিন দেখেছিলে। আর ইনি হচ্ছেন গিয়ে ওর বর।

নমস্কার—বললো দেবেন্দ্রনারায়ণ।

দুই রাধারানী যে এক এ বিষয়ে সন্দেহ আগেই ঘুচে গিয়েছিল দেবেন্দ্রর—এখন সেদিনের সেই রাধারানীকে রাজরানী বেশে দেখে দুঃখে মেশানো আনন্দে, নৈরাশ্যে মেশানো আশায় হাতুড়ি পিট্‌তে লাগ্‌লো দেবেন্দ্রর বুকে।

সে স্থির করলো যে সেদিনের কথা তোলা হবে না—দুঃখের স্মৃতি মনে করিয়ে দেওয়ায় কি লাভ? সেটা যে একরকম নিষ্ঠুরতা। তবু মনের কোণে কৌতূহল খোঁচা মারে—একবার জিজ্ঞাসাই করো

না রুক্মিণীকুমারকে তার মনে আছে কিনা! মালা যে কেনে স্মৃতি বহন করে বেড়াবে সে—আর মালা যে বেচে সে যাবে সব ভুলে—এমন অস্বাভাবিক অবস্থা মন স্বীকার করে নিতে চায় না।

ছবি দেখা ও চা খাওয়ার পরে রাধারানীদের মোটরে তুলে দিয়ে যখন দুইপক্ষে প্রণাম ও নমস্কার চল্‌ছে তখন দেবেন্দ্র আর স্থির থাক্‌তে পারলো না। রাধারানীকে শুধালো—রুক্মিণীকুমার বলে কাউকে কি আপনি কখনো জানতেন!

রুক্মিণীকুমার! অনেকক্ষণ ভাবে রাধারানী, তারপর বলে—কই না, ওনামে কাউকে তো মনে পড়ে না।

শুধু মুখে নয়, তার চোখেও পূর্ব পরিচয়ের এতটুকু আভা জাগে না—সত্যিই ও নামে কোন মানুষের স্মৃতি নেই তার মনে।

প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখে দেবেন্দ্রনারায়ণ। তারপরে দুখানা মোটর গাড়ী দুদিকে চলে যায়। বাড়ী ফিরে দেবেন্দ্র ডেস্ক খুলে বনফুলের মালাটা বার করে—ভাবে ফেলে দেবে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে মন সরে না, মালা রেখে দিয়ে দেরাজ বন্ধ করে দেয়।

স্মৃতির জগতে যার যথার্থ স্থান বাস্তব জগতে তাকে আনতে চেষ্টা করলে চল্‌বে কেন?

তাই বলে আপনারা রাধারানীর উপর রাগ করবেন না—বাড়ী ফিরে গিয়ে রাত্রে বালিশে মুখ লুকিয়ে সে কেঁদেছিল কিনা—তা কি আপনারা নিশ্চয় করে বলতে পারেন!

একটিন খাঁটি ঘি

আমাদের পটলডাঙার মেসটি ছিল একটি হট্টমন্দির। বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুর বন্ধু ও আত্মীয়ের আত্মীয়, পরিচিতের অপরিচিত ও অপরিচিতের পরিচিত আসবার কামাই ছিল না। মেসের পরিভাষায় সকলেই গেষ্ট। মেসের পুরাতন ভৃত্য ও অভিভাবক গোপাল বলতো গোষ্ট বাবু। গেষ্টের প্রাদুর্ভাব সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে একটি ঘর আমরা আলাদা করে রেখেছিলাম, গেষ্টরুম, গোপাল বলতো গোষ্টবাবুর ঘর। ঘরটায় চার পাঁচখানা তক্তপোশ পাতা ছিল, পাল পার্বণ উপলক্ষ্যে যেমন পূজার বাজার বা পরীক্ষার মরশুম তক্তপোশ তুলে ফেলে ঢালা শতরঞ্চি পেতে দেওয়া হতো। রাত্রিবেলা হঠাৎ কেউ প্রবেশ করলে ভাবতে পারতো পূজার ভিড়ের তৃতীয় শ্রেণীর কামরা। অতিথি পরিচর্যা বিষয়ে আমাদের মেসের এমনি সুনাম রটেছিল যে প্রতিবেশীদের অনেকে এসে মাঝে মাঝে এক আধবেলা গেষ্ট রূপে খেয়ে যেতেন, কখনো কখনো বা এক আধরাত গেষ্টরুমে কাটিয়ে যেতেন (অনুমান করি পারিবারিক কলহ বাবদ), তাছাড়া তাশ পাশা টেলিফোন রেডিও-র সুবাদে তো অনেকেরই নিত্য যাতায়াত ছিল। অনেকে আবার শেয়ালদা স্টেশন থেকে সোজা এসে বাক্স-পেটরা নামিয়ে তখনি বেরিয়ে যেতো, ইশারায় গোপালকে বলে যেতো রাতে এসে ঘুমবো। এমন বাড়ীকে হট্টমন্দির বললে নিশ্চয় অন্যায় হয় না।

এহেন মেসে একদিন সুপ্রভাতে হরিহর এসে উপস্থিত হল। হরিহর আমার আত্মীয়, এক জেলাতেই বাড়ী, নানা উপলক্ষ্যে

আসে। তখনো ভালো করে আলো হয়নি, দরজা খুলে দিতে দিতে বল্‌লাম, আজ গাড়ী কি আগে এসে পড়েছে ?

সে বলল, না, গাড়ী ঠিক সময়েই এসেছে, তবে ট্রাম বাসের জন্যে আর অপেক্ষা করিনি, পায়ে হেঁটেই চলে এলাম।

তার পরে মন্তব্য করলো শেয়ালদা স্টেশনের কাছে থাকবার অনেক সুবিধা।

ভাবলাম নিঃসন্দেহ, অনেক সুবিধা, তবে কার ?

ওরে টিনটা ভিতরে নিয়ে আয়।

কুলি একটা টিন নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলো।

ওতে কি আছে হে ?

কেন গন্ধ পাচ্ছ না ?

কই, না।

পেতেই হবে। এখনি পাবে।

কুলি বিদায় করে বল্‌ল, সাজাদপুরের ঘি।

হরিহর অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি কিন্তু এই ভোর রাত্রে একটিন সাজাদপুরের ঘৃত সহকারে প্রবেশ তার পূর্ব কীর্তিসমূহকে ছাপিয়ে গেল। বিস্ময় ও অবিশ্বাসের মাঝামাঝি সুরে বল্‌লাম—সাজাদ-পুরের ঘি !

হরিহর বল্‌ল, তার মানে খাঁটি গাওয়া ঘি। এ বস্তু আগে সর্বত্র পাওয়া যেতো, এখন এক সাজাদপুর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না।

বলো কিহে ?

আমি আর কি বলবো—স্বয়ং কবিগুরু কি বলেছেন শোন না—তোমার জন্য একটিন সাজাদপুরের খাঁটি গব্য ঘৃত পাঠালাম।

'সে শোন না' না বলে, দেখানো বলতেও পারতো। কেন না

একটু ঠাহর করে দেখতেই নজরে পড়লো টিনের গায়ে ঐ কথা ক'টি বড় বড় কালো অক্ষরে লিখিত।

সে বল্‌ল, বানানো কথা নয়, আজকাল তোমরা অনেকেই যেমন বানিয়ে বানিয়ে চালাচ্ছো, কবিগুরু কফি খেতে খেতে বল্‌লেন, ওহে তোমার রচিত গানটিতে টাটকা কফির সুগন্ধ, ওটা কাফি রাগিণীতে গীত হলে হৃদ্য লাগবে, কিংবা উত্তরায়ণের সম্মুখের সেই শিমূল গাছটার কাছে দাঁড়িয়ে বললেন, ওহে তোমার প্রতিভার এখানো কেবল ফুলন্ত অবস্থা, এর পরে যখন ফলে পরিণত হবে আর চৈত্রের হাওয়ায় তুলো ছাড়বে তখন দিগ্‌বিদিকে পড়বে ছড়িয়ে, তোমাকে রুখবে কে ? আমরা তেমন পারিনে, শাদামাঠা লোক কিনা। ঐ দেখো কবিগুরুর উক্তির নীচে chapter and verse quot করে দিয়েছি। চেয়ে দেখি সত্যই লিখিত আছে —চিঠিপত্র—১ম খণ্ড।

হলো তো বিশ্বাস ?

আরে না, না, অবিশ্বাস করবো কেন ? তা, এতটা ঘি আনবার উদ্দেশ্য কি ?

গায়ের জামা খুলতে খুলতে বলল, উদ্দেশ্য আবার কি ? যাতায়াতের খরচটা উঠে যাবে।

মনে মনে তার ভূয়সী প্রশংসা করে বললাম, হায় কবিগুরু এমন একজন সহজাত প্রতিভাবান অর্থসচিব লাভ করলে তোমাকে আর শেষ বয়সে নাচের দল নিয়ে টাকার জন্যে হায় হায় করে ঘুরতে হতো না।

এবার সে টিনের মুখ খুলে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে আমার নাকের কাছে এনে বল্‌ল, পাচ্ছ গন্ধ ?

পাচ্ছি বইকি।

পেতেই হবে।

পোড়াদয় চেকার এই গন্ধে এমনি মশগুল হয়ে গেল যে টিকিট

চেক করতেই ভুলে গেল। বল্‌ল, নিয়ে যান কল্‌কাতায় কাড়াকাড়ি করে লোকে কিনে নেবে—এমন জিনিস তারা চোখে দেখেনি, তবে হ্যাঁ, বইয়ে পড়েছে বটে।

খদ্দের ঠিক করেছ কি ?

খদ্দের ঠিক করবো !

মনে হলে এমন অদ্ভুত কথা এই প্রথম শুনলো, তাই জবাব দেওয়ার আবশ্যক বোধ করলো না, তার বদলে বল্‌লো, নাও চা আনতে বলো।

চা পান করতে করতে হঠাৎ বলে উঠ্‌ল, কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে, কাকে দেবো, কাকে না করবো তাই এখন সমস্যা।

পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন এগুলি দশমিনিট পূর্বে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর।

তারপরে কয়েকদিন কবিগুরুর প্রশংসা পত্রের লেবেল গায়ে এঁটে সাজাদপুরের খাঁটি গাওয়া ঘি আমার ঘরের এক কোণা দখল করে রইলো আর অনুক্ষণ সমাগতগণের লোভ ও কৌতূহল বৃদ্ধি করতে থাকলো।

কয়েকদিন পরের কথা।

সিরাজগঞ্জ মেলে রওনা হওয়ার উদ্দেশ্যে হরিহর সন্ধ্যাবেলায় প্রস্তুত হচ্ছে। জিনিসপত্র গোছাবার ও মালপত্র বাঁধবার অবকাশে খাঁটি গব্যঘৃত বিক্রয় প্রচেষ্টার অভিজ্ঞতা প্রকাশ উপলক্ষ্যে সে যে ভাষা ব্যবহার করছে তা 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' ও 'সধবার একাদশী'র যুগে লিপিবদ্ধ করা চলতো, এখন একেবারেই অসম্ভব। কাজেই ভাষার প্রাকৃত উপাদানটুকু বাদ দিয়ে (বাদ দিলে কীই

বা থাকে আর কতটুকুই বা থাকে।) যথাসাধ্য বর্ণনা করতে চেষ্টা করবো।

হরি হরি খাঁটি গাওয়া ঘি এক তোলাও বিক্রি হয় নি। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ফিরে রিপোর্ট দিত, প্রতিদিনই এক রিপোর্ট। অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়ে ঘিয়ের টিন আমার ঘরের কোণে রেখে দিয়ে দেশে ফিরতে উদ্যত হয়েছে হরিহর।

বড়বাজারের দোকান থেকে সুরু করে চেনা ও অচেনা কতলোকের বাড়ীতেই না ঘিয়ের টিন নিয়ে গিয়েছে—কেউ এক ছটাক কিনতে প্রস্তুত হয়নি।

খাঁটি ঘি? মশায় বুঝি মফস্বল থেকে আসছেন?

হরিহর বলে, আজ্ঞে হাঁ, কি করে বুঝলেন?

বুঝবার অনেক উপায় আছে, আপনার পায়ের জুতো থেকে মাথার চুলের টেরিটা পর্যন্ত চেঁচিয়ে মফস্বলের ভাষায় কথা বলছে কিনা। তা ছাড়া খাঁটি ঘি! কেউ বলেও না, কেউ বিশ্বাসও করে না।

কেন স্যার, আপনার দোকানের সাইনবোর্ডেই তো লেখা আছে 'এখানে খাঁটি ঘি পাওয়া যায়।'

লেখা যখন হয়েছিল তখন সত্যই পাওয়া যেতো, খরচ লাগবে বলে ওটা তুলে ফেলা হয়নি।

কল্‌কাতায় কি খাঁটি ঘি চলে না?

তদুত্তরে দোকানের মালিক ফিরে প্রশ্ন করলেন, এখানে কোন্ জিনিসটা খাঁটি চলে? আচ্ছা এখন আসুন।

এই বলে একটি অর্ধ সম্পূর্ণ নমস্কার করলো।

কল্‌কাতার এই নমস্কার বস্তুটি খরধার খড়্গের মতো তীক্ষ্ণধারসম্পন্ন, এক আঘাতে অবাঞ্ছিত পরিচয়কে ছেদন করতে সক্ষম।

অপর এক স্থানে গিয়ে কবিগুরুর প্রশংসার দিকে দৃষ্টি

আকর্ষণ করা মাত্র দোকানী দুই হাত জোড় করে উদ্দেশ্যে প্রণাম করে বলল—আহা কী কথাই না লিখেছেন কবিগুরু। কিন্তু মুস্কিল কি জানেন তিনি অনেকরকম কথাই যে লিখেছেন। এই ধরুন না কেন লিখেছেন—"খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে।"

তার মানে কি বলতে চান যে আমি···

আজ্ঞে আমি কিছুই বলতে চাইনে, শুধু এইটুকু নিবেদন করছি, কবিগুরু ঘিয়ের কি জানেন? স্বর্গের অমৃত সম্বন্ধে বলুন, পারিজাতের মধু সম্বন্ধে বলুন মাথা পেতে শুনবো।

অপর একস্থানে যেতেই শুনলো, আপনি তো আজ কদিন টিন নিয়ে বেড়াচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি।

আজ্ঞে ঠিকই লক্ষ্য করেছেন।

বসুন। একটা সিগারেট ইচ্ছে করুন।

হরিহর সত্যই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল তাই বসে সাগ্রহে সিগারেট ধরালো। মনের মধ্যে আশা হল, এখানে ঘি বিক্রি হলেও হতে পারে।

কিছু ঘি নেবেন কি?

আজ্ঞে আমি তো নেবই না, এই গোটা কল্‌কাতা শহরে কেউ নেবে না—আপনার খাঁটি ঘি এক ছটাক বিক্রি হবে না এখানে!

কোন্ অপরাধে বলুন তো।

অপরাধ অনেক। প্রথম অপরাধ আপনার ঘিয়ের দাম জলের দাম—মাত্র দু টাকা।

কম কোথায় মশায়? দেশে পাঁচসিকেয় কিনেছি এখানে দু' টাকায় বেচছি—সের প্রতি বারো আনা—মণ প্রতি ত্রিশ টাকা লাভ। এতো ব্যবসা নয় মশায়, ডাকাতি। তবু বলছেন দাম কম।

আপনার কথা বিশ্বাস করছে কে? এখানে খাঁটি ঘি বেচতে হলে বলতে হবে দাম পাঁচ টাকা (যুদ্ধের আগের ঘটনা) তবে

আপনাকে সাড়ে চারে দিতে পারি। এ বারে শুনুন, আপনার দ্বিতীয় অপরাধ, আপনার ঘি সত্যই খাঁটি।

চমকে উঠে হরিহর বলে, সেটা কি অপরাধ হল ?

অপরাধ নয় ? ও জিনিস কল্‌কাতায়ী লোকের পেটে সইবে কেন ? এখানকার লোকে সেই ঘিকে খাঁটি বলে যাতে শতকরা পঁচিশ ভাগ মহুয়ার তেল আছে।

বিস্মিত হরিহর অনেকটা স্বগত উক্তিতে বল্‌ল, তবে না-জানি ভেজাল ঘিয়ে কী আছে ?

আর যাই থাকুক ঘি নেই—আছে এসেন্স অব্ ঘি—আজকাল কিনতে পাওয়া যায়।

তবে উপায় ?

খুব সহজ। ওর মধ্যে চার ভাগের এক ভাগ মহুয়ার তেল মিশান, দাম বলুন পাঁচ টাকা এখনি বিক্রি হয়ে যাবে।

মাপ করবেন মশায়, খাদ্যবস্তুতে ভেজাল মিশিয়ে বেচতে পারবো না।

তবে আরো কিছুদিন পথে পথে ঘুরুন, শিক্ষা হোক। আচ্ছা আসুন।

এক জায়গায় গিয়ে শুনলো চোরাই মাল বুঝি, নইলে এত সস্তায় দিচ্ছ কি করে ?

অপর এক ভদ্র গৃহস্থ বাড়ীতে উপস্থিত হয়ে খাঁটি ঘি বলবা মাত্র ভদ্রলোক চাপা গর্জনে বলে উঠল—জোচ্চোর। তারপর সশব্দে দরজা এঁটে দিল।

চার পাঁচদিন এই-ভাবে ঘোরাঘুরির পর হরিহর বহুজনজ্ঞাত একটি অভিজ্ঞতায় উপস্থিত হলো—সংসারে খাঁটি জিনিস অচল।

অতএব হরিহরের খাঁটি ঘি টিনের মধ্যে অচল অটল হয়ে আমার ঘরের নৈঋত কোণ জুড়ে বিরাজ করতে লাগলো।

হরিহর যাওয়ার সময় বলে গেল—ঘি-টা রইলো যদি কেউ কিনতে চায় দু টাকাতেই দিয়ো, বেশি নিয়ো না।

সত্যকথা বলতে কি, দেখা গেল যে, কখনো কখনো সংসারে খাঁটি জিনিসও চলে। নতুবা হরিহরের ঘি মেসের দু'একজন কেন কিনবে? আবার মেসে আড্ডা জমাবার উদ্দেশ্যে যে-সব প্রতিবেশী আসতো তাদের কেউ কেউ কখনো কখনো পাকা দেখা বা জামাইষষ্ঠী উপলক্ষ্যে কিনতো সেই ঘি। তারা বলল—হরিহর-বাবুর ক্ষতি হলেও আমাদের লাভ হলো—এত সস্তায় এমন জিনিস আর কোথায় পেতাম।

ভাবলাম এখানেই হরিহরের ঘিয়ের ইতিহাস শেষ—কিন্তু, ক'দিন বাদেই বুঝতে পারলাম—না, শেষ নয় সূচনা মাত্র।

পাঠক, এতক্ষণ ভূমিকা চলছিল, এবারে গল্পের প্রকৃত আরম্ভ।

॥ ৩ ॥

দার্শনিকেরা বলেন, কারণ ছাড়া কার্য হয় না। দার্শনিকেরা বলুন। তৎসত্ত্বেও সংসারে নিত্য দেখিতেছি যে কারণ ছাড়া কার্য ঘটিতেছে। এই দেখুন না কেন, ইস্কুলে এত ধনী মানীর পুত্র থাকিতে গরীব মাস্টার বেচারীর ছেলেটি এবারে তৃতীয়বার ফেল করিল কেন! কোন্ কারণের ইহা কার্য? আবার দেখুন, বৃদ্ধ নিতাইবাবু বেশ সুস্থ সবল থাকিতে কিশোর নাতিটি মারা গেল কেন? ইহাই বা কোন্ অনিবার্য কারণের অপরিহার্য কার্য? আরো দেখুন, রামেশ্বরের সঙ্গে নবনীর বিবাহ হইতেছে না কেন? কোন কারণ নাই। রামেশ্বর শিক্ষিত, সুপুরুষ যুবক, ভালো চাকুরী করে। নবনী শিক্ষিতা সুশ্রী তরুণী। বংশের বর্ণের সাংসারিক অবস্থার কোন বাধা নাই, এমন কি পাশাপাশি বাড়ী

হইলে উভয় পক্ষের অভিভাবকদের যে একটুখানি চক্ষু লজ্জার মতো সৃষ্টি হয় তাহারও অভাব। তাহারা পাশাপাশি বাড়ীর অধিবাসী নয়। তবে হাঁ, একই পাড়ার অধিবাসী বটে। ইহাকেও যথেষ্ট কারণ মনে করা উচিত হইবে না। তবে কেন? এই কেনর উত্তর দান দর্শন বিজ্ঞান মনস্তত্ত্বের শক্তির অসাধ্য। তবে আমার পাঠক-পাঠিকার অসাধ্য না হইতেও পারে ভরসায় সমস্ত বিষয়টা বিবৃত করিতেছি—বিচার করিয়া দেখুন কারণ ছাড়া কার্য ঘটে কিনা।

আগেই বলিয়াছি, রামেশ্বর শিক্ষিত সুপুরুষ যুবক, অল্প বয়সেই এমন এক চাকুরীর প্রথম ধাপে স্থান পাইয়াছে, যাহার অনন্ত সোপানশ্রেণী কেন্দ্রীয় সরকারী চাকুরীর স্বর্গলোকে উন্নীত হইয়াছে—সকলেই জানে, রামেশ্বরও জানে, একদিন এমন উচ্চে তাহার মাথা দৃষ্ট হইবে যে আত্মীয় স্বজন ও পরিচিত ব্যক্তি ঈর্ষানলে দগ্ধ হইতে থাকিবে। বলাবাহুল্য সব দেশেই এমন বর সাদরে বরণীয়, আর নাকি তাহার মূল্যটাও শিরঃপীড়ার সৃষ্টিকারক। নবনী সম্বন্ধেও প্রায় অনুরূপ গুণের আরোপ করা যায়, তবে সে চাকুরী করে না বটে, তবে তাহার পিতা সেই জাতের চাকুরী করেন যাহাতে কাজের চাপের লঘুতা বেতনের অঙ্কের গুরুত্বে পূরণ হইয়া যায়। রামেশ্বর ও নবনীর পরিচয় কোথায় কিভাবে হইল জানি না। দু' জনেই এক পাড়ায় থাকে, উভয়ের বিবাহেচ্ছা প্রকাশ হইবার আগে পর্যন্ত দুই পরিবারের মধ্যে অল্পস্বল্প যাতায়াত ছিল। অবশ্য এখন তাহা বন্ধ! হয় তো সেই সূত্রেই পরিচয় হইয়াছিল। তবে এইটুকু ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, মনোরথের পথ সব সময়ে রাজপথ নয়, বরঞ্চ অলিগলির প্রতিই তাহার ঝোঁক কিছু বেশী। আর প্রজাপতি যে পথের নিশানা অনুসরণ করিয়া ফুলের গন্ধে আকৃষ্ট হয় তাহাও তো মানচিত্রে চিহ্নিত নয়।

ক্রমে খবরটা দুই পরিবারের অভিভাবকের কানে উঠিল। রামেশ্বরের পিতা সুরেশ্বরবাবু রাশভারি লোক (ওজনেও), শুনিয়া

বলিলেন, না। অধিক শব্দ প্রয়োগ বা কারণ প্রদর্শন আবশ্যক বোধ করিলেন না (পাঠক লক্ষ্য করুন, রামেশ্বরের পিতা কারণ দেখাইলেন না)। সুরেশ্বরবাবুর প্রতিক্রিয়া শুনিয়া নবনীর পিতা রণেশবাবু বলিলেন, সেকাল আর নেই, মেয়ের বিয়ে এখন দায় নয়, আমার মেয়ের বরের অভাব ঘটবে না। অর্ধপথে রামেশ্বর নবনীর বিবাহসঙ্কল্প স্বপ্নে বিলীন হইল। এমত অবস্থায় তাহাদের যাহা করা উচিত ছিল, তাহারা করিল না। নবনী বিষপান বা উদ্বন্ধন গ্রহণ বা ঢাকুরিয়া লেকে আত্মনিমজ্জন করিল না। আবার রামেশ্বরও নিরুদ্দিষ্ট হইল না বা সন্ন্যাসী সাজিল না। সে পূর্ববৎ নিয়মিত অফিসে যাতায়াত করিতে এবং নবনী পূর্ববৎ নিয়মিত উলের পোষাক বুনিতে লাগিল। রণেশবাবু অত্যল্পকাল মধ্যে নবনীর বিবাহ স্থির করিয়া ফেলিলেন। বরপক্ষ কলকাতার মানুষ, অবস্থাও ভালো, বরটিও ভালো রোজগার করে, তবে নিতান্ত অসহায়, ব্যক্তিত্ব বর্জিত প্রাণী, বাংলায় যাকে বলে ভালো মানুষ। সুরেশ্বরবাবু পুত্রের বিবাহ স্থির করিবার কোন উদ্যম দেখাইলেন না। তাঁহার ধারণা হাঁ বা না শব্দ দুটির দ্বারা যাহা করা সম্ভব তাহার অধিক তাহার কর্তব্য নাই।

পাঠক-পাঠিকারা ভাবিতে পারেন, হরিহরের অবিক্রীত একটিন খাঁটি ঘিয়ের সঙ্গে নবনী রামেশ্বরের এই ব্যর্থ পরিণয় কাহিনীর সম্বন্ধ কী? সংসারে কাহার সঙ্গে যে কাহার সম্বন্ধ, কোন সূতায় যে কোন বস্তু বাঁধা, কোথায় টান দিলে যে কোথায় টান পড়ে বোঝা কি এতই সহজ। আগামীকল্য নবনীর পাকাদেখার দিন। রণেশবাবু বরপক্ষের আপ্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রচুর ভোজের আয়োজন করিতেছেন। এবারে আভাসে ঘিয়ের গন্ধ কি পাওয়া যাইতেছে না! ভবিতব্যের ইঙ্গিত বহিয়া হরিহরের একটিন খাঁটি ঘি আমার ঘরের কোণে অপেক্ষা করিতেছে। গ্রীক নাটকের চরম মুহূর্তে অঘটনঘটন পটীয়ান দেবতার আবির্ভাবের মতো উক্ত ঘৃত আসিল বলিয়া।

॥ ৪ ॥

পাকাদেখার খাওয়াটা যথাসম্ভব নিখুঁৎ করিবার উদ্দেশ্য রণেশবাবু হরিহরের খাঁটি গাওয়া ঘি পাঁচ সের কিনিয়া লইয়া গেলেন—একেবারে নির্ভেজাল ঘিয়েভাজা লুচি খাওয়াইবেন। অবশ্য নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বেশী নয়। বরপক্ষের তিনজন—বরের পিতা নিতাইবাবু, বরের ছোট ভাই রতন এবং বরের একমাত্র মাতুল রামযশবাবু। আর কি ভাবিয়া জানি না সুরেশ্বরবাবুরও নিমন্ত্রণ হইল। আর তিনিও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। রণেশবাবু ভাবিলেন একবার আসিয়া দেখিয়া যাক আমার মেয়ের বর জোটে কিনা। আর সুরেশ্বরবাবু ভাবিলেন দেখিয়া আসা যাক পাকা-দেখা কতখানি পোক্ত হয়। আর আমারও নিমন্ত্রণ হইল—খাঁটি ঘি আনার কল্যাণেই পাওয়া গিয়াছে কিনা।

আশীর্বাদাদি হইয়া গেলে আমরা কয়েকজনে আহারে বসিলাম —প্রচুর আয়োজন। লুচি পরিবেশন করিতেই সৌরভে ঘর ভরিয়া গেল। আহ্লাদে রণেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, একেবারে খাঁটি ঘি, পাবনা থেকে আনা—কলকাতায় এমনটি পাবেন না। হায় তখন কি সরল চিত্ত রণেশবাবু জানিতেন কোন বিষধরের গর্তে হাত দিতেছেন। রণেশবাবুর মন্তব্যে বরপক্ষ তেমন উৎসাহ প্রকাশ করিলেন না, কিন্তু অপ্রত্যাশিত ভাবে উৎসাহ আসিল সুরেশ্বরের তরফ হইতে। তিনি বলিলেন, চমৎকার। বহুকাল এমনটি খাইনি, আর খাবোই বা কোথা থেকে। কল্‌কাতার ঘি মানে বিষ।

ঘৃতাহুতি প্রাপ্ত অগ্নিশিখার মতো রণেশবাবুর উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিল, যা বলেছেন সুরেশ্বরবাবু, আস্ত বিষ।

আরে শুধু কি আমি বলেছি! আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কি বলেছেন পড়েন নি?

শুধু কি তাই পড়েছি, আচার্য রায়ের কাছে যে রসায়ণ শাস্ত্র পড়েছি।

তবে !

রণেশবাবু বলিলেন, আর কবিগুরু কি বলেছেন জানেন—'তোমার জন্য একটিন খাঁটি ঘি পাঠালাম।' মানে পত্নীকে লিখেছিলেন।

তবেই দেখুন ঘিয়ের মর্যাদা বুঝতেন তিনি। আর সেই মর্যাদা কত অল্প সময়ের মধ্যে নষ্ট হয়ে গেল।

রণেশবাবু বলিলেন—হবে না! যত সব চোর জোচ্চোর হারামজাদা ঢুকেছে ঘিয়ের ব্যবসায়ে। সাপের চর্বি বাঘের চর্বি মিশোচ্ছে, নষ্ট হয়ে গেল দেশের স্বাস্থ্য।

সুরেশ্বরবাবু বলিলেন, সাজা হওয়া উচিত।

রণেশবাবু বলেন, কিন্তু হচ্ছে আর কই? যার ফাঁসি শূল আন্দামান হওয়া উচিত ঘুষের জোরে বিশ পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিয়েই খালাস পাচ্ছে। ওরে লুচি নিয়ে—।

যখন দুইজনে ঘৃততত্ত্ব সম্বন্ধে ওজস্বিনী আলোচনা করিতেছেন তখন তাঁহারা লক্ষ্য করেন নাই যে বরপক্ষ প্রায় হাত গুটাইয়া বসিয়া আছেন। যথেষ্ট কারণও ছিল। রামযশ মানে বরের সাক্ষাৎ মাতুল মানে নিতাইবাবুর সাক্ষাৎ শালা মানে তদীয় গৃহিনীর সাক্ষাৎ একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা একজন ঘৃত ব্যবসায়ী। আর ভেজাল ঘি বেচিবার অপরাধে একবার বিশ টাকা, আরেকবার পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিয়াছেন। দ্বিতীয় বারের রায়ে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য করিয়াছেন এই শ্রেণীর ব্যবসায়ী জাতির স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে,—ইহাদের যাহাতে 'ডেটারেণ্ট পানিশমেণ্ট' হয় তাহার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নিরপরাধ রণেশবাবু না জানিয়া কীটের খোঁজে কেউটে সাপের গর্তে হাত দিয়া ফেলিয়াছেন। বরপক্ষ এক যোগে বলিয়া উঠিলেন, না, না, লুচি আর চাই না।

রণেশবাবু বলিয়া উঠিলেন, চাই না কি? চাইতেই হবে।

বরপক্ষের পাতে লুচি পড়িল।

সুরেশ্বরবাবু বলিলেন, নির্ভয়ে খেয়ে যান—এ সাপের চর্বি নয়।

রামযশবাবু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, মশায় ঘি আমরাও খাই, তবে এত আধিক্যেতা করিনে।

রণেশবাবু বলিলেন, যদি কিছু মনে না করেন তবে বলি এ-রকমটি খাননি, কেননা, কল্‌কাতায় পাওয়া যায় না।

রামযশবাবু বলিলেন, আমরা ঘি আনাই পশ্চিম থেকে।

হাথরাস থেকে নাকি? তবেই মরেছেন।

কেন?

কেন কি। পরশুরামের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড পড়েননি?

আবার না জানিয়া সাপের গর্তে হাত দিলেন রণেশবাবু। রামযশবাবুর ঘিয়ের দোকানটির নাম সিদ্ধেশ্বরী ভাণ্ডার।

নিতাইবাবু বিরক্তির সঙ্গে বলিয়া উঠিলেন, মশাই ঘিয়ের মধ্যে এত কবিগুরু, আচার্য রায়, পরশুরাম আসে কি করে?

তাই যদি বললেন—সাপের চর্বি, বাঘের চর্বিই বা আসে কোথা থেকে।

ঠিক বলেছেন, বলিয়া ওঠেন সুরেশ্বরবাবু।

নিতাইবাবু বলিলেন, ও সব হিংসুকদের কথায় বিশ্বাস করবেন না।

রণেশবাবু বলেন, মশায় কবিগুরু, আচার্য রায়, পরশুরাম এদের কথায় বিশ্বাস না করলে আর কাকে বিশ্বাস করবো।

বিশ্বাস করবেন আমাকে।

তাই তো বিশ্বাস করছি—বলুন এমন ঘি আর কখনো খেয়েছেন কিনা।

এটা কি একটা ঘি হলো? ছ্যা।

এই ভাবে হরিহরের খাঁটি ঘি-কে মন্থন করিয়া বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ যে হলাহল তুলিল তাহার পরিণাম হইল শোচনীয়। কোনরকমে আহারের অভিনয় শেষ করিয়া বরপক্ষ বিদায় হইল—শিষ্টতার আবরণটুকুও বুঝি রক্ষা পাইল না।

রামযশ বাড়ী ফিরিয়াই নিতাইবাবুর পত্নীর কাছে বলিল, দিদি এখানে যদি মহেশের বিয়ে দাও তবে আমি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে যাবো।

সে কি কথা! ছি ছি অমন বলতে নেই। তারপর নিতাইবাবুর পত্নী ওরফে মহেশের জননী ওরফে রামযশের ভগ্নী সমস্ত ব্যাপার বুঝিয়া শুনিয়া বলিলেন, এখানে বিয়ে হতেই পারে না।

নিতাইবাবু বলিলেন, বলো কি, পাকা-দেখা হয়ে গিয়েছে যে।

অমন কত পাকা দেখা কেঁচে যাচ্ছে।

কিন্তু লোকে কি বলবে?

আর এমনিতেই বা লোকে কি বলতে বাকি রেখেছে? চোর জোচ্চোর হারামজাদা ঘুষখোর কী না বলেছে। না বাপু অমন সব ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে সুখ পাওয়া যাবে না। রামযশ এখনি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দে।

একমাত্র ভ্রাতার একমাত্র ভগ্নীর একমাত্র স্বামী ক্ষীণ কণ্ঠে আপত্তি করিলেন—যদি মামলা করে।

তুমি আছ কি করতে।

ভয় নেই দিদি, আমি আছি।

নিতাইবাবু বলিলেন—তুমি আছ, তবে তোমার দু' দুবার জরিমানা হয় কেন?

এমন কথার ভাষায় উত্তর সম্ভব নয় তাই, দণ্ডবিধান ভবিতব্যের আকাশে ঝুলাইয়া রাখিয়া নিতাইবাবুর পত্নী কন্যাপক্ষকে চিঠি লিখিবার উদ্দেশ্যে রমেশকে লইয়া প্রস্থান করিলেন।

॥ ৫ ॥

বরপক্ষের চিঠি পাইয়া রণেশবাবু মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন—পরশুদিন বিবাহের দিন—এখন উপায় ?

ঠিক সেই সময় সুরেশ্বরবাবু আসিয়াছিলেন হরিহরের খাঁটি ঘি কোথায় পাওয়া যাইবে সেই সন্ধানে। তিনি সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, বেটারা কখনো ঘি খেয়েছে যে ঘিয়ের মর্যাদা বুঝবে।

কিন্তু এদিকে যে আমার মর্যাদা ধুলোয় লুটোয়।

ধুলোয় লুটোলেই হলো ? সংসারে বরের অভাব নেই। এখন বলুন ঘিটা কোথায় পেয়েছিলেন ?

সুরেশ্বরবাবু ! খাঁটি ঘি পাওয়ার চেয়ে ভালো বর পাওয়া অনেক কঠিন ।

কি বাতুলের মতো কথা বলছেন রণেশবাবু। ভালো বর তো আমার বাড়ীতেই আছে—কিন্তু খাঁটি ঘি ?

বলছেন কি সুরেশ্বরবাবু ?

ঠিক কথাই বলছি, রামেশ্বর বিয়ে করবে আপনার মেয়েকে আর সেটা হবে ঐ ধার্য তারিখেই। নিন্ নিশ্চিন্ত হলেন তো। এবারে বলুন খাঁটি ঘিয়ের ঠিকানা।

এমন সময় আমার প্রবেশে সে ঠিকানা ও বাকি ঘিটুকু করায়ত্ত হইল সুরেশ্বরবাবুর। যথাসময়ে রামেশ্বরের সঙ্গে নবনীর যথাশাস্ত্র বিবাহ হইয়া গেল। হরিহরের কাছে জরুরী লোক পাঠাইয়া এক মন খাঁটি গাওয়া ঘি আনাইলাম—তন্মধ্যে আধমণ সুরেশ্বরবাবু যৌতুক বলিয়া আদায় করিয়া লইলেন। বাকি আধ-মণে নিমন্ত্রিতগণ আপ্যায়িত হইয়া খাঁটি ঘিয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

রণেশবাবু ও সুরেশ্বরবাবুর সহযোগিতায় হরিহরের খাঁটি ঘিয়ের ব্যবসা জমিয়া উঠিল। অল্প দিনেই সে বেশ দু'পয়সা সঞ্চয় করিল। যুদ্ধের সময়ে জাপানী বোমার আঘাতে তাহার মৃত্যু হইলে তাহার পুত্র রামহরি ব্যবসা চালাইতে লাগিল। এখনো চালাইতেছে। তবে দুঃখের কথা এই যে, এখন সে দু'হাতে ভেজাল মিশাইতেছে এবং চার হাতে পয়সা কুড়াইতেছে।

যার যেথা স্থান

নিরাপদবাবু চল্লিশ বছর হাওড়া রেল অফিসে চাকুরী করে অবসর নিচ্ছেন, তাকে সম্মান দেখানোর উদ্দেশ্যে পাড়ার হাই স্কুলে সভার আয়োজন হয়েছে। দিনটা রবিবার সময়টা সন্ধ্যা, কাজেই লোকের অভাব হয়নি, তা প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন সভ্য সমাগম হয়েছে। পাশে বারান্দায় নিরাপদবাবু ধুতি-চাদর পরে সময়োচিত গাম্ভীর্য অবলম্বন করে দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ করছেন, ডাক পড়লেই ভিতরে যাবেন। ঐ আলাপের ফাঁকে ফাঁকে আড়চোখে সভ্যসংখ্যা দেখে নিচ্ছেন, কে কে এলো। নাঃ মুস্তাফিটা নিশ্চয় আসবে না, ওকে ডিঙ্গিয়ে উচ্চতর পদে গিয়েছিলাম। হাঁ, মৌলিক এসেছে দেখছি—লোকটি বরাবর আমার বশংবদ। ভালো দেখে একটি মালার আয়োজন নিশ্চয়ই হয়েছে, আর উপহারও কিছু দেবে বই কি, আর কিছু না হোক ধুতি-চাদর। অবশ্য গরদের জোর প্রত্যাশা করা কিছু নয়—দুর্মূল্যের বাজার। আর মানপত্র। —কে লিখেছে ? মুখুজ্জ্যে লেখে তো ভালো হয়—ছোকরার হাত ভালো, হাতের অক্ষরও সুদৃশ্য—ধর্মঘটের দিনে দেয়ালপত্রগুলো তো ঐ লেখে। এই রকম অনেক সময়োচিত চিন্তার স্রোত বইছিল তার মনের মধ্যে। এমন সময় দু'জন প্রধান সভ্য এসে তাঁকে সবিনয়ে ভিতরে আসতে অনুরোধ করলো। সময় হয়েছে নাকি বলে চমকে উঠে তিনি বললেন—চলো তা হলে। ভাবটা যেন তিনি এ সব বিষয়ে নিতান্ত উদাসীন কেবল কর্তব্যের খাতিরেই।

পাঁচটার সভা যথা-সময়ে সাতটায় আরম্ভ হল। অফিসে নিরাপদবাবুর পদে নূতন আসীন গুপ্তবাবু সভাপতি, হাইস্কুলের

হেড মাস্টার প্রধান অতিথি (ঐ সর্তের ইঙ্গিতেই তিনি স্কুল ঘরটি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন)। বাঙ্গালীর সভা প্রায় নিখুঁত হয় না। প্রথমেই মাইকটি বিকল হয়ে গেল। অনেক চেষ্টাতেও যখন সারানো সম্ভব হলো না তখন সেটাকে শিখণ্ডীর মতো সামনে খাড়া রেখে বক্তৃতা চললো, অসুবিধা হওয়ার কথা নয়, যেহেতু চল্লিশজনের মহতী সভায় মাইকের প্রয়োজন হয় না। তারপরে মাল্যদানের সময়ে আবার গোলযোগ। একটি মালা তিনটি উদ্‌গ্রীব কণ্ঠ। যাই হোক সে সমস্যাও চুকে গেল, কেন না, নিরাপদবাবুর কণ্ঠটি বেঢপ লম্বা, অফিসে আড়ালে তাঁকে জিরাফ বলতো, তিনি গলা বাড়িয়ে দিয়ে নেকে জিতে মালাটি কণ্ঠস্থ করলেন। তারপরে উদ্বোধন সঙ্গীত। তাতেও গোলমাল।— সভ্যদের মধ্যে যাঁরা গাইয়ে তাঁদের পুজি Pool করে দেখা গেল একটি মাত্র গানই সম্বল—'যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গলো ঝড়ে।'—কাজেই ঐ অনিবার্য রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে সভার কাজ আরম্ভ হলো। ভূতপুর্ব ভারতসম্রাট পঞ্চম জর্জের পুরাতন ছবির ফ্রেমে নূতন বাঁধানো মানপত্র পঠিত হলো। হে দরদী বন্ধু, হে বিদায়ী সুহৃদ, হে পূর্ব রেলপথের হাওড়া অফিসের মহা-করণিক ইত্যাদি বয়ানে এক-একটি প্যারাগ্রাফ—নিরাপদবাবুর সত্য, আনুমানিক ও কল্পিত গুণে পূর্ণ। আমরা সভার দীর্ঘ ক্লান্তিকর বর্ণনার পুনরুক্তি করতে চাইনে, যে হেতু সংবাদপত্রে সকলেই পাঠ করেছেন। কেবল সভাপতি, প্রধান অতিথি ও নিরাপদবাবুর বক্তৃতার দু-চারটি উল্লেখযোগ্য অংশ উদ্ধার করেই কর্তব্য সমাপন করবো।—

প্রধান অতিথি হেড মাস্টার মহাশয় অনুপস্থিত ছাত্রদের সম্বোধন করে বললেন, হে ছাত্রগণ, সততা ও অধ্যবসায়ে যে কত উন্নতি সম্ভব তার মহৎ দৃষ্টান্ত নিরাপদবাবু। তিনি কুড়ি টাকা বেতনে চাকরী জীবন সুরু করে অফিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ অলঙ্কৃত করেছেন। অতএব হে ছাত্রগণ ইত্যাদি ইত্যাদি। অতঃপর

সভাপতির বক্তৃতা। তিনি মানপত্রখানি তুলে ধরে বললেন—স্বাধীন হয়েছে বলেই এমন সম্ভব হলো—নতুবা সম্রাটের ছবি খুলে ফেলে সেই ফ্রেমে নিরাপদবাবুর মানপত্র বাঁধানো কি সম্ভব হতো। (করতালি)

অবশেষে নিরাপদবাবু বললেন—বন্ধুগণ, চল্লিশ বৎসর আপনাদের মধ্যে বাস করে আপনাদের ছেড়ে যেতে মন সরছে না। তবু যে যাচ্ছি তার কারণ জন্মগ্রামে ফিরে গিয়ে জন্মগ্রামের সেবা করে বাকী জীবনটুকু কাটাবো। গ্রাম সেবাই দেশ সেবা—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, জাতির জনক গান্ধীজী সকলেই এই উপদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

সভান্তে হাল্কা জলযোগের ব্যবস্থা ছিল—তারপরে যে যার ঘরে প্রস্থান করলেন। তার পরদিন সাতটা কুড়ির লোকালে নিরাপদবাবু মোটঘাট নিয়ে জন্মগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলেন।

নিরাপদবাবু একজন আদর্শবাদী ব্যক্তি। তিনি বাল্যকালে ভোরবেলায় ছোলা ভিজা ও আদা খেয়ে ডন কুস্তি করেছেন, ভক্তিযোগ পড়েছেন, যৌবনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধ মুখস্থ করেছেন, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের বক্তৃতা শুনেছেন, সরকারী চাকুরে হওয়া সত্ত্বেও গোপনে চরখা কেটেছেন এবং গান্ধীজীর ইয়ং ইণ্ডিয়া পড়েছেন। আর এই সবের প্রভাবে আবিষ্কার করেছেন যে ভারতবর্ষ মানেই গ্রাম, আর গ্রামের সেবা মানেই দেশের সেবা। কিন্তু সে-পক্ষে একমাত্র অন্তরায় গ্রামে তাঁর বাড়ী হওয়া সত্ত্বেও গ্রামে যাওয়ার উপায় তাঁর নেই, শহরের যুপ-কাষ্ঠে তিনি গলবদ্ধ রজ্জু। অবশ্য ছুটি-ছাটায় মাঝে মাঝে তিনি গ্রামে গিয়েছেন, গ্রামের সমস্যা-গুলোর প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, আর চলে আসবার পরেই গ্রামের লোকে বলেছে বাঁচা গেল, যত সব···। তিনি তাদের ভরসা দিয়েছেন যে অবসর নিয়েই গ্রামে স্থায়ীভাবে এসে বসবেন। ঘোরতর আদর্শবাদী

না হয়ে কিঞ্চিত পরিমাণে বাস্তববাদী হলে লক্ষ্য করতেন যে তাঁর এই আশ্বাস বাক্যে কারো মুখে আনন্দের লক্ষণ দেখা দেয়নি—বরঞ্চ হয় তো উল্টোটাই দেখা গিয়েছে। আজ তাঁর জীবনের ও তাঁর গ্রাম নোয়াপুরের জীবনের সেই শুভ দিন। নিরাপদববু গ্রামে স্থায়ীভাবে ফিরে আসছেন। কয়েক দিন আগে বাল্যবন্ধু নিতাইকে কিছু টাকা পাঠিয়েছিলেন বাড়ী-ঘরগুলো যেন মেরামত করে রাখে। বলা বাহুল্য টাকা পেয়েই নিতাই হলুদের দাদন করলো, আসুক তখন দেখা যাবে। নিরাপদবাবু রেলে কাজ করে শিক্ষা পেয়েছিলেন যে, রেলগাড়ী ঠিক সময়ে চলে না। সেই ত্রুটি তিনি নিজ আচরণে সংশোধন করে নিয়েছিলেন। নিয়মিত তাঁর আনাগোনা। গ্রামবাসিগণের সমবেত আশা সমূলে ধ্বংস করে যথা সময়ে তিনি গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন।

নিতাই প্রথমে তাকে দেখতে পেলো, আনন্দের আতিশয্যে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আরে এসো, এসো, আমরা সবাই তোমার অপেক্ষায় ছিলাম। তারপর এবারে স্থায়ীভাবে এলে তো! মালপত্র তো অনেক দেখছি—স্থায়ী বলেই তো মনে হচ্ছে। যাক এবারে একটা নির্ভর করবার মতো লোক পাওয়া গেল। যে দিন-কাল পড়েছে, বুঝতেই তো পারছ।

নিতাই ভাই বাড়ী-ঘরগুলো মেরামত করা হয়েছে তো।

নিশ্চয়, নিশ্চয়, দেখবে চলো।

বাড়ী-ঘরের জীর্ণ দশা লক্ষ্য করে নিরাপদবাবু বললেন,—এযে সমস্তই ভাঙ্গাচোরা।

আগে আরো বেশী ছিলো, তবু তো এখন অনেক সাব্যস্ত হয়েছে। তা ছাড়া কীই বা পাঠিয়েছিলে—আর কী বা করবো। খড়, কাঠ, দড়ি সবই মাগ্গি। সব শালা চোর, মন্ত্রী থেকে মজুর অবধি সব শালা চোর—কি আর বলবো, তোমার তো অজানা কিছুই নাই।

না হয় নিজে থেকে আর কিছু খরচ করতে দিয়ে দিতাম।

করেছি বই কি! তাতেও এই দশা। তা যখন পারো দিয়ো, না পারো না দিয়ো। তোমার কাছে আর ফিরে চাইবো না, তুমি তো এখন গাঁয়ের জন্য উৎসর্গীকৃত জীবনী। শেষের ঐ শব্দ সম্প্রতি সে শিখেছে তার ছোট ছেলের গান্ধীজী সম্বন্ধে লিখিত একটি প্রবন্ধ থেকে।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রামের আবালবৃদ্ধ-বনিতা বুঝে নিল যে একটি শাঁসালো ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছে, এখন নিজ নিজ প্রয়োজন অনুসারে দোহন করে নিলেই হয়।

গ্রামের বারোয়ারী পূজার চাঁদা আদায় উপলক্ষে ছেলের দল আসতেই নিরাপদবাবু সানন্দে দশ টাকা নগদ বের করে দিলেন, আর তারপর বারোয়ারী উৎসবের প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করলেন। ছেলেরা বলল, স্যার এখন যাই, পরে সময় মতো এসে শুনবো।

নিরাপদবাবু বললেন, বেশ তো আজ সন্ধ্যাবেলাতে এখানে এসো। কেমন আসবে তো সব।

আসবো বলে তারা সবেগে প্রস্থান করলো। এক কথায় দশ টাকা চাঁদা পাওয়ার বিস্ময় তাদের ভিতরে ভিতরে ঠেলা মারছিল।

তাদের অভিজ্ঞতা এই যে আট আনা চাঁদা আদায় করতে হলে দশবার হাঁটাহাঁটি করতে হয় তা ছাড়া অনুরোধ উপরোধ, কাকুতি মিনতি তো আছেই। আর এখানে কিনা এক কথায় নগদ দশ টাকা, তারা স্থির করলো—লোকটা যেমন ধনী যেমনি নির্বোধ।

পটলা বলল,—লোকটার নিশ্চয় অনেক টাকা। মনটা বয়সে সকলের ছোট, সে বলল, টাকা থাকলেই হয় না, টাকা তো কেদার মহাজনেরও আছে। বোকা হওয়া চাই। টাকা আর বোকায় মিললে তবে তো লোকের ছহল-বহল।

তার বক্তব্যে সকলে অভিভূত হয়ে গেল। স্বাধীন দেশের স্বাধীন চিত্ত বালক।

বলা বাহুল্য বারোয়ারী পূজার সার্থকতা সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনবার জন্যে কেউ এলো না নিরাপদবাবুর বাড়ীতে। তৈরী বক্তৃতা গলাধঃকরণ করে তিনি শুয়ে পড়লেন, শুয়ে শুয়ে সিদ্ধান্ত করলেন আমাদের গ্রামগুলোতে শুভেচ্ছা যথেষ্ট আছে কেবল উদ্যম কিছু কম। শীঘ্রই সে ভুলও ভাঙ্গলো। গ্রামে উদ্যমের সাড়াও কম নয়, তবে সব সময়ে তেমন উপলক্ষ জোটে না বলেই প্রমাণ পাওয়া যায় না, মনে হয় সব নিরুদ্যম।

ইতিমধ্যে কেদার মহাজনের গদী থেকে হাজার টাকা চুরি হয়ে গেল। কেদার হাজার অঙ্কটাকে ফাঁপিয়ে দশ হাজার করে থানায় গিয়ে ডায়ারী করলো আর গাঁয়ের ৫।৭ জন ছেলের নাম করে এলো। দারোগা এসে গ্রেপ্তার করে তাদের চালান দিল। এবারে মামলা। একদিন কেদার এসে নিরাপদর কাছে প্রস্তাব করলো যে আপনি যদি সাক্ষী দিতে রাজী হন যে ঐ ছেলেগুলোকে আমার গদীর কাছে সন্ধ্যাবেলায় যাতায়াত করতে দেখেছেন তবে বজ্জাতগুলোর সাজা হয়ে যায়—গাঁয়ে শান্তি আসে।

বিস্মিত নিরাপদ বলল—সে কি কথা মশাই?

কেদার বলল—কেন খারাপ কথাটাই বা কি? গাঁয়ে শান্তি আসুক এ কি আপনি চান না?

তা অবশ্যই চাই।

তবে না হয় দুটো কথা বানিয়েই বললেন, মিথ্যা বলতে তো আর অনুরোধ করছি না।

বানিয়ে বলা আর মিথ্যের মধ্যে যে এমন দুস্তর ব্যবধান তা এই প্রথম শুনলো নিরাপদ।

নিরাপদ বললেন, নীতি বলে তো একটা কিছু আছে।

আছে বই কি। আমার ছেলের নাম নীতিশ, মেয়ের সুনীতি-

বালা, নাতির পড়ে নীতি মঞ্জরী, আমাকে নীতি কি শেখাবেন মশাই।

নিরাপদ চুপ করে থাকেন।

তবে আমার হয়ে তুটো কথা বলবেন না? আচ্ছা দেখা যাবে বলে চলে যায় কেদার মহাজন।

পরদিন দেখা দেয় বাল্য বন্ধু নিতাই, বলে, বড় বিপদেই পড়া গিয়েছে হে।

কে আবার বিপদ ঘটালো হে।

ঐ ক্যাপিটালিস্টটা—শালা কেদার! চুরির হাঙ্গামায় জড়িয়ে ধরিয়ে দিয়েছে ক'টা ছেলেকে হীরের টুকরা সব।

খুবই তুঃখের কথা, বলেন নিরাপদ।

এখন তুমি যদি ভাই বলো যে সেদিন সন্ধ্যাবেলায় তোমার বাড়ীতে বসে কবিগুরু সম্বন্ধে বা জাতির জনক সম্বন্ধে আলোচনা করছিল তা হলে ছেলেগুলো খালাস পেয়ে যায়।

নিরাপদ বলেন, সে কি করে হয়— সত্য আছে তো?

আছে আর কই? সত্যকেও জড়িয়েছে।

না ভাই সত্যকে তোমরা জড়িয়ো না।

আরে আমরা আবার জড়ালাম কই, জড়ালো তো ঐ পুলিশে।

ভাই নিতাই আমি সে সত্যের কথা বলছি না।

নিতাই বলে, আমরা তো এক সত্যকেই জান, চিন্তাহরণের শালা। তা হলে তুমি পারবে না?

মিথ্যা বলতে পারবো না।

আরে তুমি তো মিথ্যা বলছ না, কেবল কেদার বেটার মিথ্যার প্রতিরোধ করছ। তাহলে আসি, কিন্তু কাজটা ভালো করলে না —বলে নিতাই প্রস্থান করে।

শূন্য গৃহে বসে নিরাপদ চিন্তা করতে চেষ্টা করেন এ কেমন করে সম্ভব হল! শহরে যেখানে থাকতো নানা হাঙ্গামা, আজ ধর্মঘট,

কাল মিছিল, পরশু বোমা, পটকা কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্যে তো কেউ তাকে এমন পীড়াপীড়ি করেনি। এখানে সব এমন কেন? নিরাপদ চিন্তা করেন, বাল্যকালের সে সুখের স্বপ্নের মাধুর্যের গ্রাম কোথায় গেল? কোথায় গেল সে সব সুহৃদ। ঘোরতর আদর্শবাদী না হলে তিনি বুঝতে পারতেন যে বাল্য-কালের সুহৃদগণের অর্ধেক মৃত, আর বাকি অর্ধেকের অর্ধ ভাগ গ্রামান্তরী হয়েছে—অবশিষ্টের মতে আর মনে এমন পরিবর্তন যে চিনবার উপায় নাই। আর কালেরও পরিবর্তন ঘটেছে চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসরে। শহরের নিকৃষ্ট দোষগুলো গ্রামে এসেছে, আসেনি শহরের গুণগুলো। গ্রাম দুই দলে বিভক্ত হয়ে প্রচণ্ড মামলায় মেতে উঠলো—নিরপেক্ষ ঐ নিরাপদ। কিন্তু নিরপেক্ষ যে সব সময়ে নিরাপদ নয়, তার প্রমাণ হাতে হাতে মিললো। আজ তার ক্ষেতের ধান কেটে নিয়ে গেল, কাল তার মরাই লুট হলো, পরশু কপির বাগান তছনচ হলো, তারপর দিন একরাতের মধ্যে পুকুরের মাছ চুরি হয়ে গেল। কেউ তার বাড়ী আসে না, কেউ তার সঙ্গে কথা কয় না; পথে ঘাটে দেখা হলে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন কি সার্বজনীন পূজোর চাঁদা চাইতেও কেউ গেল না তার কাছে। গ্রামের মধ্যে একঘরে নিরাপদ। তবে দীর্ঘকাল একঘরে অবস্থাতে থাকতে হলো না, একদিন রাতে আগুন লেগে ঘরখানি পুড়ে গেল—কোনরকমে প্রাণ বাঁচিয়ে বেরিয়ে এলেন নিরাপদ। সর্বস্বান্ত নিরাশ্রয় নিরাপদ ফিরে রওনা হলেন শহরে।

সন্ধ্যাবেলায় শহরের সেই পুরাতন ক্লাবঘরে নিরাপদবাবু প্রবেশ করবামাত্র অনেকগুলি উল্লসিত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়ে উঠলো, এই যে নিরাপদ, নিরাপদ বাবু, নিরাপদ দাদা, নিরাপদ কাকা! কখন এলে, কখন এলেন, হঠাৎ খবর না দিয়েই।

তিনি বললেন, তবু ভালো যে ভুলে যাওনি।

একজন বলল, এরই মধ্যে?

অন্যজন বলল, আমরা তো ভাই তোমার গাঁয়ের লোক নই।

তৃতীয়জন বলল, এইমাত্র তোমার কথাই হচ্ছিল।

তৃতীয় ব্যক্তির কথা মিথ্যা নয়। পূজার আগে ক্লাবের, মেম্বারগণ থিয়েটার করবে। থিয়েটারে নিরাপদের খুব শখ, তিনি একজন ভাল অভিনেতা।

নিরাপদদা পূজোর আগে শরৎবাবুর রমা অভিনয় করবার ইচ্ছা, তোমার অভাব বড় অনুভব করছিলাম—যাক এসেছ ভালই হয়েছে।

একজন বলল, নিরাপদকে বেণী ঘোষালের পার্ট দাও। এই কয়মাস গাঁয়ে থেকে অনেক বেণী ঘোষাল দেখেছে।

অনেকে হেসে উঠলো। বোঝা গেল যে, তারা নিরাপদের গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতা জানে। না জানবার কারণ নাই, নিরাপদ নিয়মিত চিঠি লিখতেন।

নিরাপদ বললেন, বেণী ঘোষাল নয়, বয়সে মিললে রমেশের পার্ট নিতাম।

কেন মাথাও ফাটিয়েছে নাকি, না ফৌজদারি মোকদ্দমায় ফেলেছে ?

ওসব কিছুই নয় ভাই, গাঁয়ের লোকগুলো খুব বোকা। নইলে আমার ঘর পুড়িয়ে দিত না।

সকলে বিস্ময়ে বলে উঠে, ঘরও পুড়িয়েছে নাকি ? তবে না হয় এবারে গৃহদাহ অভিনয় করা যাক। কি সাজবে—মহিম নাকি ?

নিরাপদ গোটা কয়েক পান মুখের মধ্যে দিতে দিতে বলল, মহিমও থাক, রমেশও থাক—আমি এবারে সিনের দড়ি টানবার ভার নিলাম।

হঠাৎ রঙ্গমঞ্চ থেকে নেপথ্যে যাওয়ার শখ কেন ?

কেন বলবো ? এতদিন গ্রামকে দেখেছিলাম দর্শকের আসন থেকে, এবারে দেখে এসেছি নেপথ্য থেকে। শেষেরটাই বেশি চিত্তাকর্ষক

নিরাপদের বিশ্লেষণ শুনে ঘরশুদ্ধ সকলে হেসে উঠল—কেবল নিরাপদ সে হাসিতে যোগ দিল না, গম্ভীর হয়ে রইলো।

প্রাণান্তকর গল্প

যমদূত পিছু পিছু তাড়া করলে মনের ঠিক কী অবস্থা হয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলা সম্ভব নয়; কিন্তু সম্পাদকের হাতে পড়লে যেমনটী হয়ে থাকে তার চেয়ে বোধ করি বেশি কঠিন নয়, বিশেষ সে সম্পাদক আবার যদি পূজাসংখ্যার কাগজ বের করতে উদ্যত হন। অধিক বলবো কি, বৃদ্ধ চাণক্যের আমলে যে সাময়িক পত্র ছিল না তা এক প্রকার নিশ্চিত নতুবা তিনি নন্দী ভৃঙ্গী দন্তীদের সঙ্গে সম্পাদকের নামটারও উল্লেখ করতেন। আমার এই গল্প সম্পাদক বনাম লেখকের নিদারুণ অভিজ্ঞতা।

পাঠক বোধহয় ইতিমধ্যেই বুঝতে পেরেছেন যে আমি একজন সাহিত্যিক, গল্প লিখি, সম্পাদকগণ বলেন গাল্পিক। গল্প লিখতে বিদ্যার আবশ্যক হয় না, নানা ভাষার কোটেশনও অনাবশ্যক—অবশ্য কিছু বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, সে পরিমাণ বুদ্ধি আমার আছে, আরও বেশি থাকলে গল্প না লিখে উপন্যাস লিখতাম। এখন, পূজার বাজারে এ হেন গাল্পিকের বিরাম নাই, সকলেরই দাবি,—একটি গল্প চাই। কিন্তু চাইলেই পাওয়া যায় এমন বস্তু গল্প নয়। তবে সে কথা শোনে কে। পারবো না বললে ভাবে মোচড় দিয়ে কিছু বেশি আদায় করবার চেষ্টায় আছি। হায় কেমন করে সম্পাদক-দের বোঝাবো যে সব বস্তুর মতো লেখকের শক্তিরও সীমা আছে, বিশেষ বাঙালী সমাজের ক্ষুদ্র গণ্ডীর যাবতীয় অভিজ্ঞতা এতগুলি লেখকের কলমের আঘাতে আঘাতে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কবে শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই নিদারুণ সত্যটা স্বীকার করে নিলে সাহিত্যিকতা ও সম্পাদকতা দুই-ই ছেড়ে দিতে হয়। তা সম্ভব

নয়, বছর ঘোরে, পূজা আসে, সঙ্গে আসে পূজা সংখ্যার গল্পের তাগিদ আর তারপরেই আসেন সশরীরে সম্পাদক।

সেই চির পুরাতন হাসিটি মসৃণ পুরাতন মুদ্রাটির মতো ওষ্ঠপুটের ফাঁকে একটুখানি বের করে বলেন, গল্পটির জন্য এলাম।

এবারে আর সম্ভব নয়, মাথায় কিছু আসছে না।

সে কি একটা কথা হল! কে না জানে যে আপনার মাথা কুবেরের ভাণ্ডার।

কালধর্মে কুবের এখন দেউলে।

কথাটাকে উচ্চাঙ্গের রসিকতা মনে করে সম্পাদক এমন উচ্চরবে হেসে উঠলেন যে ভয় হল পাছে আমার দশ ইঞ্চি গাঁথুনির দেয়াল (কর্পোরেশনকে ফাঁকি দিয়ে ১৫" স্থলে ১০" গেঁথেছি) বুঝি বা খসে যায়।

দিন, দিন, ওসব মামুলী কথা রাখুন। এই বলে তিনি পকেটে হাত চালিয়ে দিলেন। বোঝা গেল এখন মোক্ষম যুক্তি প্রয়োগ করবেন।

সলজ্জ ভাবে (তাঁর লজ্জা কেন জানি না) একগোছা নোট আমার হাতে গুঁজে দিতে দিতে বললেন—এবারে পুরো করেই দিলাম—থার্ড প্ল্যানে ইনফ্লেশন বাড়ছে কিনা, পুরো না দিলে চলবে কেন!

পুরো বলতে কী বোঝায় বুঝলাম না, গুণতেও ভরসা হয় না, হয়তো বা তাতেই সম্মতির স্বীকৃতি হবে। তাই নোটশুদ্ধ হাত-খানা একটু আড়ষ্টভাবে রাখলাম—না-গ্রহণ না-বর্জন নীতির দৃষ্টান্ত-স্বরূপ। কিন্তু একি সম্পাদক কোথায়! মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়েছেন। তিনি জানেন টাকা গছিয়ে দেওয়ার পরে আর বসে থাকতে নেই—অযথা চায়ের খরচ বাড়িয়ে লেখকের সময় ও অর্থনাশ করে কি লাভ। তাছাড়া, একটু আধ্যাত্মিক কারণও আছে। প্রতিমার চিত্রকর চক্ষুদানের পরে নিঃশব্দে প্রস্থান করে। লেখকের হাতে

টাকা গছিয়ে দেওয়া সেই চক্ষুদানের অনুরূপ। ঐ টাকা গছানো পর্যন্তই যা কঠিন, তারপরে দিবসান্তে যেমন রাত্রি, রাত্রির অন্তে যেমন দিবস অবধারিত—তেমনি সমস্তই সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট। সম্পাদক অন্তর্হিত হলেন, হায়, আমিও যদি অমনি যাদুমন্ত্র বলে অন্তর্হিত হতে পারতাম।

॥ ২ ॥

বড়শি গিলবার পরে মাছের এবং টাকা গিলবার পরে লেখকের দশা প্রায় একরকম দাঁড়ায়, একটু টান পড়তেই প্রাণ বের হয় আর কি! ঐ 'প্রায়' শব্দটির বিশেষ অর্থ আছে। মাছের টান শুধু সূতোয়, লেখকের টান অনেক রকমে। চিঠির পরে চিঠি আসে গল্পটি, লোকের পরে লোক আসে গল্পটি; গৃহশত্রু টেলিফোন নিরন্তর ঝঙ্কার তোলে গল্পটি; এমন কি মাঝে মাঝে স্বপ্নেও সম্পাদক দেখা দিয়ে দাবি জানান গল্পটি। দিনে রাতে স্বপ্নে জাগরণে আর লেখকের স্বস্তি থাকে না। কাজেই এবারে আমার অবস্থাটা পাঠকে নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। কেবল বুঝতে পারছেন না মা সরস্বতী, তাঁরই নিষ্ঠুর ইঙ্গিতে কল্পনার রাজপথ থেকে গলিখুঁজি সমস্ত রুদ্ধ। কিছুই মাথায় আসে না। আর যা আসে ভাবলে দেখতে পাই সমস্তই কেউ না কেউ বাল্মীকি থেকে বনফুল লিখে ফেলেছে। আমিও কম করে হাজার খানেক গল্প লিখেছি, কাল্পনিক কিম্ভূত বা বাস্তব কোন পরিস্থিতিই বাদ দিই না, কাজেই হাত যখন শূন্য, মাথাও তদ্রূপ। অথচ শয়নে জাগরণে টেলিফোনে লোকমুখে নিত্য ধ্বনিত হচ্ছে গল্পটি গল্পটি! অবস্থা যখন চরমে পৌঁছিয়াছে তখন সহসা 'বাণীর বিদ্যুৎদীপ্ত ছন্দবান' মনের মধ্যে ঝলসে উঠল, ঠিক, ঠিক, একেবারে নিঃস্ব নই, এখনো কিছু হাতে আছে। গলায় দড়ি দিয়ে উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করলে মনের যে অবস্থা হয় নিতান্ত

স্বাভাবিক কারণেই—এ পর্যন্ত তা লিপিবদ্ধ হয়নি। আমি কেন তা না লিখি। কথাটি মনে হওয়া মাত্র বড় স্বস্তি অনুভব করলাম। সরস্বতী নিষ্ঠুর নন, বিধাতা উদাসীন নন, তেমন করে প্রার্থনা করতে জানলে তাঁরা অভীষ্ট পূরণ করতে ক্ষান্ত হন না। কিন্তু উপায়টা কি! গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়লে অভিজ্ঞতা অবশ্যই একটা অর্জিত হবে কিন্তু জেনে এসে তা কি লিখে ফেলা সম্ভব হবে! অনেক চিন্তার পরে আবিষ্কার করলাম 'যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান'। স্থির করলাম যে গল্পের আগাগোড়া লিখে ফেলে উপসংহারটুকু হাতে রেখে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়বো, কাছে থাকবে, কাছে উপস্থিত থাকবে আমার পুরাতন বিশ্বস্ত ভৃত্য দামোদর। সে আমার মুখ চোখের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবে, আর ঠিক চরম সঙ্কটের পূর্ব মুহূর্তে তীক্ষ্ণ কাটারি দিয়ে দড়ি কেটে দেবে। আমি পুনরায় ভূতলে অবতরণ করে ওর কাছে বিবরণ শুনে নিয়ে গল্পের উপসংহারটুকু লিখে ফেলবো। বাস্ তারপরে সম্পাদককে পাঠিয়ে দিতে কতক্ষণ! আর এরকম একটা অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হলে শুধু সম্পাদক খুশি হবেন না সংসারের জ্ঞানভাণ্ডারের ঐশ্বর্যও বাড়বে। তবে আর বিলম্ব কিসের? অতএব গল্পটি লিখে ফেললাম, বিষয়টা সম্পাদক ও লেখকের মধ্যে বড়শি টানাটানি, নাম দিলাম 'প্রাণান্তকর গল্প' (হায় কে জানতো গল্পটি এমন সার্থকনামা হবে)। তারপরে দামোদরকে নিভৃতে সব বুঝিয়ে বললাম, আরও বললাম, চট করে সময়মতো দড়ি কেটে আমাকে নামাতে পারলে পূজা-বোনাস হিসাবে এক মাসের বেতন দান করবো। দামোদর একজন প্রগত ভৃত্য, সব কথা শুনে, সব ব্যবস্থা বুঝে সহজেই রাজী হল। তখন সেই উপসংহারহীন গল্পটি, ফাউণ্টেন পেন, দড়ি ও কাটারি নিয়ে দু'জনে রবীন্দ্র সরোবরের এক নির্জন স্থানে গিয়ে উপস্থিত হলাম! তখন দুপুর বেলা কাজেই লোক আসবার আশঙ্কা ছিল না। তার-পরে দামোদরকে যথাকর্তব্য আর একবার বুঝিয়ে দিলাম—আমার

মুখ চোখের ভাবগতিক লক্ষ্য করতে হবে আর চরম সঙ্কটের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে দড়ি কেটে নামিয়ে নিতে হবে আমাকে। তখন গল্পটি, ফাউন্টেন পেন ও কাটারিখানা তার হাতে দিয়ে গাছের একটি নাতিউচ্চ ডালের উপরে দাঁড়িয়ে গলায় ফাঁস বেঁধে প্রস্তুত হলাম। বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য দামোদর আমাকে ঠেলে দিল। পাঠক আমি ফাঁসবদ্ধ অবস্থায় শূন্যে ঝুলছি।

আমার এই নিখুঁত অভিযান পরিকল্পনার মধ্যে একটি যে খুঁত ছিল তা আগে মনে পড়েনি। দামোদর একজন নবস্বাক্ষর বা Neo literate, আর সঙ্গদোষে সে লিখতে শুরু করেছে, আর যেসব সম্পাদক চাকরকে খুশি করে মনিবকে হাত করতে চায় তারা সেগুলো ছেপে ওকে কিছু কিছু টাকা দেয়। ওর উপরেও যে পূজা-সংখ্যার দাবি থাকতে পারে স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার চৈতন্যে ক্রমেই ভাঁটা পড়ে আসছে। বাহবা দামোদর, বাহবা কেমন তন্ময়ভাবে আমার মুখ-চোখের অবস্থা নিরীক্ষণ করছে, এমন তন্ময়তা তো ওর নিত্যকর্মে দেখিনি! বেশ, বেশ। চৈতন্য বিলীয়মান প্রায়। এখন দড়ি কাটে না কেন! একি, একি কাটারি না নিয়ে ও কলম হাতে করল কেন! কি লিখছে ও? উপসংহারটুকু পূরণ করছে নাকি? চৈতন্যের শেষ শিখা নির্বাপিত হলো বলে! ওকি, ওকি উপসংহার লিখে ফেলে গল্পটা নিয়ে ও ছুটলো নাকি? কোথায়, কেন? এমন অপূর্ববস্তু যে কোন পূজাসংখ্যা মোটা টাকায় লুফে নেবে। একথা জানে প্রখ্যাত সাহিত্যিকের বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য! সত্যিই কি ছুটলো! এদিকে আমি যে মরি? ও ছুটলো, আমি মরলাম, সম্পাদক (কোন্ কাগজের জানি না) পেলো পূজাসংখ্যার গল্প!

দৃষ্টিভেদে

অবশেষে ক্ষেমেশ ও পরমেশ প্রসিদ্ধ গৌড়ীয় উন্মাদাগারে ভর্তি হয়ে একেবারে ঠিক পাশাপাশি ঘরে স্থান পেল। যারা ওদের ইতিহাস জানতো কপালে হাত ঠেকিয়ে বল্‌লে, একেই বলে নিয়তি। যারা জানতো না কিছুই বুঝতে পারলো না। গল্পটা তাদের জন্যেই লিখিত।

ক্ষেমেশ ও পরমেশ এক গাঁয়ের বাসিন্দা, প্রতিবেশী বললেই চলে। যুদ্ধ বেধে উঠ্‌তে যখন ইষ্টক খণ্ড থেকে পিষ্টক খণ্ড পর্যন্ত সমস্ত বস্তু ক্রেয় পদার্থ হয়ে উঠল আর দামটাও নাকি শনৈঃ শনৈঃ টাইফয়েড জ্বরের তাপমাত্রার মতো বাড়তে বাড়তে নিরীহ জন-সাধারণের সাধ্যের অতীত হয়ে গেল তখন ওরা বল্‌ল, চলো ব্যবসা করা যাক।

ওরা কেবল প্রতিবেশী নয়, বাল্যকাল থেকে এক ডাণ্ডাগুলিতে খেলা করেছে, গুরুমশায়ের কাছে এক বেতে মার খেয়েছে, আর বাল্যকালের এই ঐক্য বাড়তে বাড়তে যথাসময়ে দুজনের এক সঙ্গে গুম্ফ শ্মশ্রুর রেখা দেখা দিয়েছে আর অবশেষে দুইজনে একই পিতার দুই কন্যাকে বিবাহ করে নৈমিত্তিক যোগাযোগকে নিত্য যোগাযোগে পরিণত করে ফেলেছে। তাই যখন তারা এজমালিতে ব্যবসার প্রস্তাব করলো কেউ বিস্মিত বোধ করেনি। তখনো তারা মানে যারা ওদের ইতিহাস জানতো কপালে হাত ঠেকিয়ে বলছিল, একেই বলে নিয়তি।

স্থির হল যে ক্ষেমেশ গ্রামে গ্রামে ঘুরে মাল সংগ্রহ করবে আর পরমেশ কলকাতায় বসে বিক্রি করবে। যুদ্ধের কৃপায় এখন

কেনাবেচার কাজ অত্যন্ত সহজ। একমাত্র ক্রেতা মিলিটারি বিভাগ, ক্রেতা খুঁজে বার করতে হয় না, সে-ই বিক্রেতাকে খুঁজে বার করে। আর আগেই বলেছি বিধাতা চরাচরে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সমস্ত এখন ক্রয়যোগ্য বস্তু। এহেন যুদ্ধাবস্থাকে মানুষে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করবে এমন দুঃস্বপ্ন একমাত্র অব্যবসায়ীরাই দেখে থাকে।

ইতিমধ্যে পরমেশ একটি প্রমাণ সাইজের দাড়ি গজিয়ে ফেলল। এ-দাড়ি আধিভৌতিক নয়, আধিদৈবিক। বিবর্তনবাদের যে নিয়মের বশে জিরাফের গলা লম্বা হয়, বাঘ ও জেব্রার গায়ে ডোরা দেখা দেয়, রাজনৈতিকগণের কণ্ঠস্বর উচ্চ ও গতিবিধি প্রচ্ছন্ন হয় সেই অমোঘ নিয়মের তাড়নাতেই পরমেশের দাড়ি গজালো। মিলিটারির সঙ্গে কারবার করে অল্পদিনেই সে বুঝে ফেলেছে সাহেব লোকের কাছে, বিশেষ মার্কিন সাহেব লোকের কাছে, "হোলি বিয়ার্ডের" বড় মর্যাদা। পরমেশ যখন উচ্চাঙ্গের হাসিতে "হোলি বিয়ার্ড" আলোকিত করে পাঁচ টাকার জিনিসের দাম পঁচিশ টাকা বলতো তিনতারাওয়ালা মার্কিন জেনারেল বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে গুদামঘর দেখিয়ে দিয়ে পাইপ চাপা অধরোষ্ঠে অব্যক্তস্বরে অর্ধোক্ত বলতো—ও. কে. হোলি বিয়ার্ড। জঙ্গী সমাজে পরমেশ এখন দি হোলি বিয়ার্ড নামে পরিচিত।

এদিকে পরমেশ দাড়ি গজিয়ে বিক্রির সুবিধে করে নিয়েছে জানতে পেরে ক্ষেমেশ একটি প্রমাণ সাইজের শিখা গজিয়ে ফেলল। তার অভিজ্ঞতা এই গ্রামাঞ্চলে জিনিস খরিদের কাজে শিখা বড় সহায়ক।

দা ঠাকুর এসেছেন বসতে দে বলে যে-চাষী গেরস্থ অভ্যর্থনা করতো, জিনিস বেচবার পরে হিসাব করতে গিয়ে দেখতে পেত যে দা ঠাকুর তাকেই বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। ক্ষেমেশের জবাপুষ্প সমন্বিত শিখাগ্র গ্রামে গ্রামে লঙ্কাকাণ্ড বাধিয়ে ফিরতে লাগলো। মোট কথা অল্প দিনের মধ্যে ভারতীয় সনাতন শ্মশ্রু ও সনাতনী

শিখার কৃপায় ওদের ব্যবসা হরিণগেলা অজগরের পেটের মতো ফুলে উঠল। তখন ওরা পৈত্রিক মাঠকোঠার বাড়ি ভেঙ্গে ফেলে দিয়ে ইষ্টকালয়ের পত্তন করলো। বাড়ী দুটোর ভিত যখন কোমর পর্যন্ত উঠেছে তখন কুমারিকা থেকে কাশ্মীর অবধি নড়ে উঠল. গান্ধীজী হাঁক দিয়েছেন "ভারত ছাড়ো।"

এই "ভারত ছাড়ো" হাঁকের সঙ্গে ইংরাজের ও আমাদের গল্পের ভাগ্য অপ্রত্যাশিতভাবে জড়িত। ইংরাজ ভারত ছেড়ে গিয়ে বাঁচলো আর তাদের ভারত ছাড়া করতে গিয়ে আমাদের গল্পের ভরাডুবি ঘটলো। এবারে আরম্ভ করি সেই ভরাডুবির পালা।

॥ ২ ॥

বছর তিনেক পরে ক্ষেমেশ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে (ইংরাজকে ভারত ছাড়াতে সে জেলে গিয়েছিল) গ্রামে ফিরে এসে দেখলো যে তার বাড়ীর ভিত তেমনি কোমর অবধি আছে আর পরমেশের বাড়ীর তেতলার ছাদের উপরে পরমেশের দীর্ঘ শ্মশ্রু তাকে কৃষ্ণ পতাকা প্রদর্শন করে বাতাসে মন্দ মন্দ আন্দোলিত হচ্ছে। এসো এসো ভাই ক্ষেমেশ, তুমি আসবে সংবাদ পেয়েই দাঁড়িয়ে আছি।

ক্ষেমেশ বলল—তুমিও জেলে যাবে বলেছিলে শেষে কি হল?

সব ঠিকঠাক, এমন সময়ে বাপুজির এক গোপন দূত এসে বলল, তোমার উপরে হুকুম এ অঞ্চলের আন্দোলন চালাতে হবে, জেলে গেলে তোমার চলবে না।

তা আমার বাড়ীটা ওঠেনি কেন?

পাগল নাকি? বাড়ী শেষ হলে সরকার নিশ্চয় বাজেয়াপ্ত করে নিতো।

এটুকুও তো নিতে পারতো।

ছেলের হাতের মোয়া আর কি। আমার নামে ট্রান্সফার করে রেখেছি না।

ব্যবসা কেমন চলছে?

ব্যবসা কার সঙ্গে। ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে! ছিঃ! পরমেশের ঐ সংক্ষিপ্ত ছিঃ শব্দটির মধ্যে স্বাধীনতাকামী ভারতের ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠল।

টাকা কড়ি?

একটি বিড়ি বের করতে গিয়ে মন্তব্য করলো, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছি·কি না, হাঁ কি বল্‌ছিলে? টাকা কড়ি? কণ্ঠস্বর যতদূর সম্ভব নীচে নামিয়ে বলল, সব স্বাধীনতা সংগ্রামে খরচ হয়ে গিয়েছে। একবার ভেবেছিলাম একটা তালিকা রাখি, কিন্তু পাছে পুলিসের হাতে পড়ে তাই আর সে চেষ্টা করিনি।

তা .যা হয়েছে, এখন বাড়ীটা আমার নামে ট্রান্সফার করে দাও।

এখনো বিপদ কাটেনি, আগে ইংরেজ ভারত ছাড়ুক!

তা আমার স্ত্রী পুত্র কোথায়?

তাদের মাতুলালয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখানে থাকা নিরাপদ নয়।

স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই ক্ষেমেশ প্রকৃত অবস্থা বুঝতে পারলো কিন্তু তখন আর কী করবার আছে। দু'চার দিন পরে সে কলকাতায় চলে এলো।

কলকাতায় আসতেই শুভানুধ্যায়ী ও বন্ধুবান্ধবরা বললো, মামলা করো।

ক্ষেমেশ বললো, আমি কপর্দকহীন।

সে জন্য ভেবো না, আমরা জোগাড় করবো। তখন সে কিছু পুরাতন দলিলদস্তাবেজ সংগ্রহ করে উকীল বাড়িতে হাঁটাহাঁটি শুরু করে দিল।

পরমেশ আগেই ব্যবসা গুটিয়ে ফেলে সমস্ত নগদ টাকায় রূপান্তরিত করেছিল আর সে টাকা কিনা দেশের কাজে ব্যয় হয়ে গিয়েছে। কাজেই তাকেও সময়োচিত বেশ পরিবর্তন করতে হল। 'দি হোলি বিয়ার্ডের' সমর্থক গেরুয়া জামা কাপড়, রুদ্রাক্ষের মালা, ললাটে রক্তচন্দন, হাতে কমণ্ডলু—ঠিক যেমনটি হওয়া উচিৎ কিছুমাত্র ত্রুটি হল না। শত্রুরা কানাঘুষায় বলতে শুরু করলো যে ক্ষেমেশ যাতে পাগল হয়ে যায় সেই উদ্দেশ্যে তান্ত্রিক অভিচার শুরু করেছে সে। কারণ সে নাকি উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করে জেনেছে যে বাদী পাগল প্রতিপন্ন হলে মামলা চালাবার অধিকার হারায়।

তখন বন্ধুরা এসে ক্ষেমেশকে দুঃসংবাদটি দান করলো : (এসব কাজে বন্ধুর কখনো অভাব হয় না) ওহে পরমেশ যে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে।

আমি করেছি হাইকোর্টে নালিশ।

সেই সঙ্গে তান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে আপত্তি কি ?

উদ্দেশ্য ?

ও তোমাকে উচাটন কিনা পাগল করতে চায়, আমাদেরও সেই ক্রিয়া আরম্ভ করা উচিত যাতে ও পাগল হয়ে যায়।

এসব পরামর্শ বড় অগ্রাহ্য হয় না। কাজেই এ পক্ষ থেকেও অভিচার শুরু হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে একদিন একটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। পথে দেখা হওয়ায় পরমেশ ও ক্ষেমেশ পরস্পরকে আক্রমণ করে বসল। একজনের হাতের কমণ্ডলু ও অপরের বগলের নথীপত্র ধুলোয় লুটোতে লাগল। পাঁচজনে মিলে ছাড়িয়ে দিলে। দুইজনেই একযোগে থানায় গিয়ে First Information লিখিয়ে বাড়ী ফিরে এলো। তারপর থেকে তারা আত্মীয়স্বজন কর্তৃক গৃহে অবরুদ্ধ! কাজেই আর মারামারির আশঙ্কা রইলো না। কিন্তু আধিভৌতিক

উৎপাতের পথ বন্ধ হলেও আধিদৈবিকের পথ খোলাই রইলো—আর অচিরে ফলও ফলল সেই পথে। প্রথমে ক্ষেমেশ পাগল হয়ে গেল, তার কিছুদিন পরে পরমেশ। যারা আধিদৈবিকে বিশ্বাসী তাঁরা বললেন হতেই হবে, মন্ত্র তো মিথ্যা হতে পারে না। আর যাঁরা আধিভৌতিকেই সন্তুষ্ট তাঁরা বললেন, এর চেয়ে অনেক কম বিপদে লোকে পাগল হয়ে যায়—এ আর এমন নূতন কি?

প্রথমে ক্ষেমেশ গিয়ে ভর্তি হল গৌড়ীয় উন্মাদ আশ্রমের ১৩ নম্বর ঘরে, কয়েক দিন পরেই ১৪ নম্বর ঘরে ভর্তি হল পরমেশ। যারা ওদের ইতিহাস জানতো বলল ঃ নিয়তি। যারা জানতো না তাদের জন্যই নেপথ্য বিবরণ প্রকাশ করলাম। পরবর্তী ঘটনা সকলেরই অজ্ঞাত—তা এবারে সবিস্তারে বর্ণনা করছি।

॥ ৩ ॥

পরদিন পরমেশ ও ক্ষেমেশের আত্মীয়স্বজন হাসপাতালে গিয়ে ওদের ভাবগতিক দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

একি ব্যাপার! দু'দিন আগেও যারা পরস্পরকে খুন না করে জলগ্রহণ করবে না প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ছিল; একজন বলতো ওর দুঃশাসনী বুকের রক্তপান করবো—অপর জন বলতো দুর্যোধনের মতো ওকে ভগ্নউরু করবো; আজ তাদের একি অপ্রত্যাশিত সৌভ্রাত্র্য। সবাই দেখলো ওরা দুজন বারান্দার একপাশে পাশাপাশি চেয়ার টেনে নিয়ে পরম নিশ্চিন্তভাবে বিশ্রম্ভালাপে নিযুক্ত। ওরা আত্মীয়দের দেখেও দেখলো না, বরঞ্চ চেয়ার দু'খানা আরও ঘনিষ্ঠভাবে টেনে নিল।

সবাই গিয়ে রেসিডেণ্ট ডাক্তারকে শুধালো, স্যার ব্যাপার কি?

তিনি বললেন, নইলে আর উন্মাদ রোগ বলছে কেন?

কিন্তু ধরুন হঠাৎ যদি আবার খুন চেপে যায়!

আমরা আছি কেন ?

কিন্তু স্যার পীনাল কোড বলেও তো একটা ব্যাপার আছে !

পাগলের আচরণ পীনাল কোডের অধিকারের বাইরে। তা ছাড়া তেমন হওয়ার আশঙ্কা নেই, তবে নিরাময় হয়ে উঠলে কি হয় কে জানে !

ওরা সবাই বলল, না, না, নিরাময় হলে আর এমন হবে কেন। তা স্যার, কতদিন লাগবে ?

এখন থাকুক কিছুদিন, ওদের কেস একেবারে হোপলেস নয়।

উন্মাদাগারে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চিকিৎসা হয়ে থাকে এপর্যন্ত সবাই জানে কিন্তু ঠিক তার প্রকৃতিটা অল্প লোকেরই পরিজ্ঞাত। ব্যাপারটা জানাজানি হলে সংসারে পাগলের সংখ্যা কমতো বই বাড়তো না। এখন রীতিটা বৈজ্ঞানিক হলেও খুব কঠিন নয়। প্রত্যেক রুগীকে একটা করে ঘরে আবদ্ধ করে চার পাঁচজন বলবান ব্যক্তি লাঠিপেটা করতে থাকে যতক্ষণ না রুগী একেবারে নিস্তেজ হয়ে শুয়ে পড়ে। অবশ্য প্রকাশ্য অপারেশন থিয়েটারে নানা দুষ্প্রাপ্য ও মূল্যবান যন্ত্রপাতি এবং ঔষধাদি সজ্জিত আছে সে-সব কেবল রুগীর আত্মীয়স্বজনদের অভিভূত করবার উদ্দেশ্যে।

যথাকালে প্রাতঃকালে পাশাপাশি ১৩ নম্বর ও ১৪ নম্বর ঘরে যথাশাস্ত্র চিকিৎসা আরম্ভ হয়ে যায়। তখন উক্ত দুই ঘর থেকে আর্তরব উঠ্‌তে থাকে, "কোথায় ভাই পরমেশ বাঁচাও !" "কোথায় ভাই ক্ষেমেশ বাঁচাও !" কিন্তু কে কাকে বাঁচাবে—দু'জনের সমান অবস্থা। ক্রমে উচ্চকণ্ঠ মৃদু ও নিস্তেজ হয়ে পড়ে, বোঝা যায় এবেলার মতো Treatment সাঙ্গ হল। আত্মীয়স্বজন এত জানতে পারে না, তারা প্রকাশ্য স্থানে বিচিত্র চিকিৎসা সরঞ্জামগুলো পরস্পরকে ইঙ্গিতে দেখায় আর মুগ্ধ হয়ে ফিরে যায়—রুগী সেরে উঠলো বলে।

সব হাসপাতালেরই চিকিৎসা রীতি প্রায় একই রকমের, তবে কিছু উনিশ বিশ থাকা অসম্ভব নয়। এই জন্যেই হাসপাতালে অভিভাবকের প্রবেশের সময় সঙ্কীর্ণ। তবু যে মাঝে মাঝে আত্মহত্যা ও গুম খুনের সংবাদ পাওয়া যায় সে কেবল ব্যবস্থার ত্রুটিতে।

প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ওদের আত্মীয়স্বজন আসে, প্রতিদিন ওদের তন্ময় ঘনিষ্ঠ প্রীতি মুগ্ধ ভাব দেখে—আর বুকভরা সংশয় নিয়ে ফিরে যায়, ভাবে হয়তো তখনই ওরা পাগল ছিল, এখনই প্রকৃতিস্থ।

ওদের আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে একজন পার্টটাইম রাজনীতিক ছিল, বিশ্বের হিত চিন্তা ছাড়া আর কিছুই তার মাথায় আসে না, সে তো রীতিমতো একটা সিদ্ধান্ত করে বসল। তার সিদ্ধান্ত এই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় কেনেডি, ক্রুশ্চেফ, মাও-সে-তুং প্রভৃতিকে উন্মাদাগারে প্রেরণ। তবে নেহেরুকে প্রেরণ করা চলবে না। তিনি গোড়া থেকেই বেজায় প্রকৃতিস্থ। কিন্তু কেমন করে অব্যবসায়িগণ বুঝবে যে এই প্রকৃতিস্থতার মূল কারণ হচ্ছে ডজনখানেক দুর্ধর্ষ বলশালী ব্যক্তি, যাদের কখনো কখনো ডন কুস্তি করতে দেখতে পেয়েছে ওরা হাসপাতালের বাগানের মধ্যেই কিন্তু বুঝতে পারেনি তাদের সার্থকতা।

একদিন ওরা হাসপাতালে আসতেই ভিজিটিং সার্জেন মেজর ভোঁসলার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। হাঁ, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসারযোগ্য ডাক্তার বটে, মুখমণ্ডল যদি বাংলাদেশে হয় তবে উদরটা গুজরাটে। সবসুদ্ধ মিলে একটা বিধাতার বিস্ময়ের হাঁ।

ওরা কেমন আছে, স্যার।

আমার তো মনে হয় ইম্প্রুভমেণ্ট হচ্ছে, আশা করি মাস-খানেকের মধ্যে রিলিজ করে দেওয়া সম্ভব হবে।

ওরা উঁকি মেরে দেখলো। এখন আর কাছে যায় না, তাতে

নাকি রুগীদের রি-অ্যাক্‌শন খারাপ হয়। পরমেশ ও ক্ষেমেশের মুখ কিছু গম্ভীর, আর চেয়ার দু'খানাও তেমন ঘনিষ্ঠ নয়।

ভালো কোথায়! এ যে পূর্ববৎ হতে চলল।

ডাক্তার বলল, আপনারা বললে তো শুনছি না, আমাদের রিপোর্ট ফেভারেবল।

হবেও বা, ভাবতে ভাবতে ওরা চলে যায়।

রুগী ভালোর দিকে, এখন আর সবদিন আত্মীয়স্বজনরা আসে না, ৪।৫ দিন পরে পরে এসে সংবাদ নিয়ে যায়।

সেদিন এসে দেখালো পরমেশ ও ক্ষেমেশ বারান্দার দুই বিপরীত প্রান্তে চেয়ার টেনে নিয়ে উপবিষ্ট, কেউ কারো সঙ্গে কথা বলছে না, কেবল একবার পরস্পরের দিকে কটমট করে তাকাচ্ছে। আরও মনে হল এতদিনে যেন ওরা চিনতে পারছে আত্মীয়দের।

তবু সন্দেহ যায় না।

কি ব্যাপার ডাক্তারবাবু, আবার কি রিল্যাপ্স করবে নাকি?

রিল্যাপ্স কোথায়? আমাদের মেশিন ক্রমেই অধিকতর অনুকূল রীডিং দিচ্ছে—ওরা দ্রুত আরোগ্যের পথে।

কিন্তু ওদের ভাবগতিক দেখে—

ভাবগতিক যাই হোক, আমাদের ইলেকট্রো' লুন্যাসিগ্রাফ মেশিন তো মিথ্যা বলতে পারে না, ওদের লুন্যাসির কোএ-ফিসিয়েণ্ট প্রায় নরম্যালসির কাছাকাছি এসেছে, এখন যে কোন দিন রিলিজড্ হবে, আপনারা প্রস্তুত থাকবেন।

পরদিন ভোরে ওদের বাড়ীতে এমার্জেন্সী মেসেজ পৌঁছলো, শীঘ্র আসুন, রুগী নরমাল হয়েছে, এখনি নিয়ে যেতে হবে।

ওরা গাড়ী নিয়ে ছুটে গিয়ে উপস্থিত হল। রুগীরা কোথায়?

অফিস ঘরের মধ্যে পরমেশ ও ক্ষেমেশ ৭।৮ জন বলশালী লোকের দ্বারা পরিবেষ্টিত অবস্থায় দণ্ডায়মান। কাছেই মেজর

ভোঁসলা। আত্মীয়স্বজন উপস্থিত হতেই রুগীরা ছাড়া পেলো, আর সেই মুহূর্তেই দুজনে হিংস্র জানোয়ারের মতো পরস্পরের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে পরস্পরকে ভূপাতিত করলো।

আজ শালার দুঃশাসনী রক্ত পান করবো।

আজ শালার দুর্যোধনী উরু ভঙ্গ করবো।

একি কাণ্ড স্যার?

রুগীরা পারফেকটলি নরম্যাল হয়েছে, ইলেকট্রো লুন্যাসি-গ্রাফের রীডিং।

কিন্তু অবস্থা এযে পূর্ববৎ হল—

তাহলে বুঝতে হবে তখনি ওরা নরম্যাল ছিল।

তবে এতদিন কী অবস্থা চলছিল?

সেটাই এবনরম্যাল, অস্বাভাবিক।

তবে উন্মাদে আর প্রকৃতিস্থে ভেদ কিসের?

দৃষ্টির। আমাদের দৃষ্টিতে ওরা এতদিনে নরম্যাল হয়েছে, এবারে বাড়ী নিয়ে যান।

তখন দুইপক্ষ গর্জমান, লম্ফমান। পরস্পরকে হন্যমান প্রকৃতিস্থ পরমেশ ও ক্ষেমেশকে গাড়ীতে চাপিয়ে আত্মীয়েরা বাড়ী ফিরে চলল।

আগের ভাব ভাষা আচরণ ফিরে পেয়েছে কাজেই ওরা প্রকৃতিস্থ ছাড়া আর কী।

কমলার ফুলশয্যা

বিয়ের পরে ফুলশয্যা না হলে অঙ্গহানি হয় অজুহাতে দক্ষিণের বাড়ীর ঠানদি এসে রমেশকে রাজি করিয়ে গেলেন।

রমেশ সহজে ঘাড় পাততে চায়নি, বলে, আর বেশী কী অঙ্গহানি হবে ঠানদি। বলে সমস্ত দেহটাই যখন গেল তখন আর একটা অঙ্গ থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি।

তা কি হয় ভাই, যে পূজোর যে মন্তর।

ঠানদি, পূজোও দেখলাম; মন্তরও দেখলাম, কিছুই আর বাকি নেই। বিয়ে করতে বের হলাম শ্রীমন্তর সপ্তডিঙা মধুকর নিয়ে, ফিরে এলাম সব খোয়ানো কাঙাল।

কেন ভাই, কমলে কামিনী কি সঙ্গে আসেনি?

রমেশ দীর্ঘনিশ্বাস চেপে বলে, না আসলেই বোধ করি ভালো ছিল, ও হতভাগিনীকে এত গঞ্জনা সহ্য করতে হতো না।

এখন একটা যেমন তেমন ফুলশয্যা না হলে গঞ্জনার ভার যে আরও বাড়বে।

তা বটে। আচ্ছা সুশীলাকে রাজি করাও।

সে মেয়ে কি আর মানুষ আছে—মাটিতে মিশিয়ে গেছে না। সেই যে ক'দিন আগে এসে বিছানা নিয়েছে, না বলেছে কথা, না দিয়েছে মুখে দানা। দুই চোখ বুঝি এতদিনে চোখের জলে অন্ধ হয়ে গেল।

রমেশ বলে, তা তোমরা যদি ভালো বোঝো ব্যবস্থা করো—কিন্তু খুব সাবধান, ধুমধাম চলবে না।

ঠানদি জিভ কেটে বলে, আবার ধুমধাম! নিতান্ত প্রথা রক্ষা না হলে নয়, তা-ই, নইলে কার প্রাণে আহ্লাদ বলো।

তারপর একটু থেমে বললেন, বেরজো যে আমার কি ছিল তোমরা তা বুঝবে না ভাই—এই বলে রমেশের স্বর্গত পিতা ব্রজমোহনের জন্য সময়োচিত অশ্রুমোচন তিনি করলেন।

॥ ২ ॥

শেষরাতে জেগে উঠে রমেশ দেখলো জানলা দিয়ে বিছানার উপরে এসে পড়া জ্যোৎস্নার ফালির সঙ্গে মিশিয়ে আর এক ফালি ঘনীভূত জ্যোৎস্নার মতো নববধূ শ্লথ বস্ত্রে শিথিল কুন্তলে নিদ্রিত। এ কয়দিন ভালো করে দেখবার অবকাশ পায়নি রমেশ, বিয়ের আগে শুনেছিল মেয়ে কালো, মুখ চোখের গড়নও সুন্দর নয়। কিন্তু আজ প্রথম সে আবিষ্কার করলো নববধূ সুন্দরী। ভাবলো বিয়ে ভাঙানির দল অমন বলেই থাকে। সে ভাবলো ভালোই হয়েছে বিয়ের আসরে দেখলে আজকে এমন করে আবিষ্কারের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতো।

সে আস্তে আস্তে ডাকলো, সুশীলা!

সুশীলা জেগে উঠে, শাড়ী সামলে নিয়ে বললো, কি?

সুশীলা, আজ তোমার চুল বেঁধে দিয়েছিল কে?

প্রাসঙ্গিক উত্তর না দিয়ে সে বলল, আচ্ছা তোমরা সকলেই আমাকে সুশীলা বলে ডাকো কেন?

রমেশ এ প্রশ্নের তাৎপর্য না বুঝতে পেরে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকাল।

বধূ বললো, আমার নাম বদল হলেই কি আমার পয় ফিরবে? আমি তো শিশুকাল থেকেই অপয়মন্ত, না মরলে আমার অলক্ষণ ঘুচবে না।

হঠাৎ রমেশের বুক ধক করে উঠল, কোথায় কি একটা দুর্মোচ্য

প্রমাদ ঘটে গিয়েছে। রমেশ শুধালো, কেন শিশুকাল থেকেই তুমি অপয়মন্ত হলে কিসে ?

নয় তো কি ! আমার জন্মের আগেই বাবা মরেছেন, আমাকে জন্মদান করে তার ছয়মাসের মধ্যেই আমার মা মারা গেছেন, মামার বাড়ীতে অনেক কষ্টে ছিলাম। হঠাৎ শুনলাম, কোথা থেকে এসে তুমি আমাকে পছন্দ করলে, দুইদিনের মধ্যেই বিয়ে হয়ে গেল, তারপরে দেখো কী সব বিপদ।

রমেশ বালিশে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়লো, এতক্ষণ সে উপুড় হয়ে শুয়ে বধূর কথা শুনছিল।

রমেশ কথা বলে না দেখে বধূ বলল, ঘুমালে নাকি ?

না।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। রমেশ সে রাতের মধ্যে আর কথা বললো না। ফুলশয্যার ফুলের আস্তরণের মধ্যে থেকে অপ্রত্যাশিত বিষধর নির্গত হয়ে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে। রমেশের সন্দেহমাত্র নাই যে নববধূ তার বিবাহিত পত্নী নয়। সে ভাবলো হায় ভগবান, এই কথাটা যদি আজ সন্ধ্যাবেলাও সে জানতে পারতো ! এখন যে ফিরবার পথ বন্ধ !

॥ ৩ ॥

রমেশের কালরাত্রি প্রভাত হল—কিন্তু দিনের আলো ফিরে এলো না তার চোখে। তার বোধ হল উদয়ের দিগন্ত থেকে অস্তাচল অবধি কে যেন কালো ভুষা দিয়ে লেপে দিয়েছে—বিশ্বের যে লিপিকার মানুষের অদৃষ্টের বিড়ম্বনার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করছে তারই প্রকাণ্ড দোয়াতের সমস্ত কালিটা যেন উপুড় হয়ে পরে গিয়েছে চরাচরের উপরে—কোথাও এতটুকু সান্ত্বনার শাদা নাই। নিঃসঙ্গ বৈঠকখানায় তক্তপোশের উপরে একাকী চিৎ হয়ে

পড়ে—কি ভাবছিল রমেশ। ভাবনার ধারাও তার সুসংলগ্ন নয় —চিন্তার সূত্র হাজার জায়গায় ছিঁড়ে গিয়েছে—জোড়া দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

এটুকু সে নিশ্চয় বুঝেছে কমলা তার পত্নী নয়, কিন্তু কার পত্নী, কার কন্যা, কি সূত্রে তার অদৃষ্টে এসে জুটলো সমস্তই অজ্ঞাত। সে ভাবছিল জানা দরকার, কিন্তু জেনেই বা কি লাভ, অদৃষ্টের স্রোতে ভেসে এসেছে তাই বলে তো ওই নিরীহ মেয়েটাকে অদৃষ্টের স্রোতে ভাসিয়ে দেওয়া যায় না। একবার ভাবলো কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্ধান করলে হয়, তখনি আবার মনে হল—গতকল্য হলেও বা এই পন্থা অবলম্বন করা চলতো, কিন্তু ফুলশয্যায় পত্নীরূপে গ্রহণ করবার পরে এমন তঞ্চকতা করা নিতান্ত অন্যায়—আর কমলাই বা কি ভাববে—হয়তো ক্ষোভে অপমানে লজ্জায় আত্মহত্যা করে বসবে। তবু জানা দরকার কার পত্নী, কার কন্যা।

এমন সময় কমলা প্রবেশ করলো। জনশূন্য বাড়ীতে নূতন বধূর যাতায়াতের বাধা ছিল না।

তোমার শরীর খারাপ না কি? এই বলে হাত দিল স্বামীর মাথায়।

রমেশ দেখলো এতদিন পরে কমলার মুখে একটি স্নিগ্ধ প্রসন্নতার আভা।

না, না, বেশ আছি, বসো।

তারপরে বললো, আচ্ছা, তুমি তো লেখা-পড়া শিখেছ বলেছিলে, বেশ তোমার নাম বানান করে লেখো দেখি।

তা বুঝি আমি পারিনে! আমার নাম বানান করা খুব সহজ—এই দেখো—বলে বড় বড় অক্ষরে লিখলো শ্রীমতি কমলা-দেবী।

এবারে মামার নাম লেখো।

তাও পারি, বলে লিখলো শ্রীতারিণীচরণ চট্টোপাধ্যায়।

আচ্ছা গ্রামের নাম লেখো দেখি—,

কমলা লিখলো ধোবাপুকুর।

কেমন পারিনি ? তুমি ভাবছিলে কি লিখতে কি লিখবো।

না, না, তা ভাববো কেন, তবে কিনা ভাবছিলাম একবার পরীক্ষা করবো কতখানি কি জানো।

ছ'জনে এইভাবে কথা চলছে এমন সময় দক্ষিণের বাড়ীর ঠানদি এসে হাজির।

তাই বলি বউকে বাড়ীর মধ্যে খুঁজে পাইনে কেন। একেবারে বৈঠকখানায় হাজির। আমাদের সময়ে ভাই এমন হওয়ার উপায় ছিল না। দিনের বেলা হেঁসেল থেকে বেরোলে কর্তাটি ঠ্যাঙা দিয়ে ঠ্যাঙ ভেঙে দিতেন।

তারপরে রমেশের দিকে তাকিয়ে বললেন—এই যে ভাই, আজ যে মুখে হাসি ফুটেছে। ফুটতেই হবে, ফুলশয্যার স্বাদই আলাদা। বুঝলে না ভাই সাতপাকই বলো আর কুশণ্ডিকাই বলো ফুলশয্যা না হলে কিছুই না।

নিজের অবস্থার সঙ্গে ঠানদির বিশ্লেষণের প্রভেদ লক্ষ্য করে রমেশ এত দুঃখের মধ্যেও কৌতুক বোধ করলো—শুধালো, হাস কোথায় দেখলে ঠানদি।

মেঘ-চাপা রোদ আর মন-চাপা হাসি দেখা যায় না অনুভব করতে হয়। ভুলে যাও কেন ভাই আমাদেরও এক সময়ে ঐ বয়স ছিল।

ঠানদির ঐ বয়সে অনুরূপ অবস্থায় কবে কি ঘটেছিল বিস্তারিত শুনবার পর রমেশ বললো, যাও ঠানদি বউকে একটু ঘর-গেরস্তালি শিখিয়ে দাও, আত্মীয় বলতে এখন এক তুমিই। একক আত্মীয়তার গৌরবে স্ফীত ঠানদি কমলাকে ঠেলে নিয়ে প্রস্থান করলেন।

রমেশ আবার দুশ্চিন্তার আবর্তে গিয়ে পড়লো—পাক খেতে খেতে ভাবলো এখন কি কর্তব্য ?

রমেশ ভাবে এ কোন্ নিষ্ঠুর অদৃষ্ট এমন বি-সম সূত্রে গ্রন্থি এঁটে দিল তাদের জীবনে। ভাবে এ তার পক্ষে একটা নির্মল কৌতুক, কিন্তু এদিকে যে দুটি অসহায় প্রাণীর প্রাণান্ত। এর পরিণাম কোথায় কিভাবে হবে কিছুতেই ভেবে পায় না সে। একবার ভাবে কমলার স্বামী নিশ্চয় ডুবে মারা গিয়েছে, আর তাকে যখন সে পত্নীরূপে গ্রহণ করেছে সেইভাবেই চলুক না কেন, মিছে ঘাঁটাঘাঁটি করে কী লাভ? বিধবা বিবাহ তো আইন ও শাস্ত্রসম্মত। কিন্তু তখনি "পরস্ত্রী" শব্দটা চোরা পাহাড়ের মতো আঘাত করে তার সঙ্কল্পের গায়। নাঃ কিছুতেই না—চলতে পারে না। যে সম্বন্ধটা চিরকাল চলবে গোড়াতেই তাতে একটা বিসদৃশ রন্ধ্র রাখা কিছু নয়। এ বিষয়ে পরামর্শ করা যায় এমন লোক তো চোখে পড়ে না। হঠাৎ মনে পড়লো হেমনলিনীকে। না, না, তা সম্ভব নয়। নিজের গোপন কথা তাকে বলা চলে, কিন্তু এই অসহায় বালিকার কথা তাকে বলা চলে না। মেয়েরা মেয়েদের স্খলন কিছুতেই সহ্য করে না। তখনি হঠাৎ মনে পড়লো আজ আবার শয্যায় তাকে পত্নীরূপে পাশে স্থান দিতে হবে। যতক্ষণ না জানতো একরকম ছিল, কিন্তু এখন জানবার পরে আর কিছুতেই সম্ভব নয়। তখনি সে কর্তব্য স্থির করে ফেলল।

বাড়ীর ভিতরে গিয়ে বলল, কমলা, আমাদের একটা সম্পত্তি আছে, বাবার মৃত্যুর পরে সব বিশৃঙ্খল হয়ে পড়েছে, এখনি আমাকে সেখানে রওনা হতে হবে।

আজই ?

হাঁ এখনই।

ক'দিন পরে ফিরবে ?

তা দিন দুই লাগবে। ঠানদি রাত্রে এখানে থাকবেন—ব্যবস্থা করে যাবো।

আচ্ছা এসো, কিন্তু দুদিনের বেশী দেরী করো না।

না, তার বেশী দেরী হবে না।

রমেশ রওনা হয়ে গেল। হোক দুইদিন, ফাঁসির আসামীর পক্ষে দুইদিন দুই বছর, অনেক কিছু ঘটতে পারে এই সময়ের মধ্যে।

॥ ৪ ॥

দিন দুই পরে রমেশ বাড়ী ফিরে এল। এই দুইদিনের নিঃসঙ্গতায় সে ভাববার অবকাশ পেয়েছে। সে স্থির করে ফেলেছে যে, কমলাকে পত্নীর আসনে বসানো উচিত হবে না, নীতি, ধর্ম, আইন, সংসারের ভালো মন্দ যেদিকে বিচার করা যাক না কেন—কমলাকে পত্নী বলে চালিয়ে দেওয়া নিতান্ত গর্হিত হবে। তবে এখন কর্তব্য কি? কর্তব্যের ঠিকঠিকানা খুঁজে পায় না সে। কমলাকে সব খুলে বললে এখনি একটা অনর্থ বাধবে, তাতে গ্রন্থি আরও জটিল হয়ে উঠবে। অথচ এমন দম্পতির অভিনয়ের জেরই বা টেনে চলা যায় কতদিন? এই সব বিষয় এই দুদিন সে উল্টে পাল্টে নানাভাবে চিন্তা করেছে। তারপর তার হঠাৎ মনে হল কমলাকে নিয়ে দেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়। এখানেও দু'জনে একা, মাঝে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর গ্রন্থি; সেখানেও দু'জনে একা হবে, মাঝে থাকবে অদৃষ্টের নিষ্ঠুর গ্রন্থি। তবু এখানকার জীবনের নৈষ্কর্মের চেয়ে দেশ ভ্রমণের ব্যস্ততা শ্রেয়ঃ—অদৃষ্টের নিষ্ঠুর গ্রন্থিটা ভুলে থাকা বোধ করি অসম্ভব হবে না। তারপরে? কিন্তু তারপরের কথা ভাববার অধিকার কী মানুষের আছে। যখন সে বিয়ে করতে চলেছিল—তখন কি এই তারপরের কথাটা মনের

কোন কোণেও ছিল ? তবে এখনই বা তারপরের কথা কেন ? অদৃষ্ট যে দুর্মোচ্য গ্রন্থি এঁটে দিয়েছে—ভবিতব্যের আঙুল হয়তো তা খুলে দেবে। কে বলতে পারে ?

দেশ ভ্রমণের কথা শুনে কমলা আনন্দে নেচে উঠল, বলল—চলো।

রমেশ শুধালো, এখনি বের হবে নাকি ?

ঈষৎ হতাশভাবে কমলা বলে, দেরী কিসের ?

অবশ্য দেরী নেই, কিন্তু বাঁধাছাঁদা তো করতে হবে।

কমলা পুনরায় উৎসাহ অনুভব করে—তা তো করতেই হবে। এই বলে হঠাৎ এমন ব্যস্ত হয়ে ওঠে যে এখনি সে গোছগাছ করতে লেগে যাবে।

রমেশ বলে, তবে সব গোছগাছ করে নাও, পরশুদিন বেরিয়ে যাবো।

বাঙালীর কাছে দেশ ভ্রমণ মানেই পশ্চিম ভ্রমণ আর পশ্চিম মানে ইতিহাস ও কিম্বদন্তীর কুহেলিকায় বিচিত্র এক স্বপ্নরাজ্য। জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করতে করতে দিল্লী আগ্রা গয়া কাশী প্রভৃতি যে কয়েকটি শহরের নাম জানা আছে তাই আবৃত্তি করতে থাকে কমলা। তারপরে যথাসময়ে তারা বেরিয়ে পড়ে পশ্চিম ভ্রমণে।

এলাহাবাদ থেকে অমৃতসর পর্যন্ত নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে অবশেষে তারা কাশীতে একটা বাড়ী ভাড়া করলো, কমলা বলেছিল, আর ঘুরে বেড়াতে পারিনে। রমেশ বলল, আচ্ছা তবে এসো, এখানে কিছুদিন জিরিয়ে নেওয়া যাক। রানামহল্লায় রমেশ একটি বাড়ী ভাড়া করলো।

এদিকে রমেশের মূল সমস্যার কোন কিনারা মিলল না, বরঞ্চ বিদেশে অপরিচিতের মধ্যে দু'জনের ঘনিষ্ঠতা আরো বাড়লো। তবে ভরসার মধ্যে এই যে নূতন নূতন জায়গায়, কখনো স্টেশনের প্লাটফমে, কখনো প্রতীক্ষালয়ে, কখনো ধর্মশালায়, কখনো গাড়ীর

কামরায় রাত্রি যাপন, এক শয্যায় শয়নের গুরুতর সমস্যাটা এক-রকম কেটে যায়। তবু রমেশ একটু দূরত্ব রক্ষা করে চলতেই চেষ্টা করে। সেটা এড়ায় না কমলার চোখে। একদিন সে হেসে বলেছিল, তুমি এমন দূরে দূরে থাকো, যেন আমি পরস্ত্রী!

রমেশ মনে মনে চমকে ওঠে, কিন্তু চমকটাকে চেপে দিয়ে হেসে উত্তর দেয়—সত্যি পরস্ত্রী ভাবলে কি আর দূরে রাখতাম।

তবে তাই ভাবো না কেন।

হাসির হাওয়ায় যে ঢেউগুলো উঠলো তা খুব রুদ্র নয়, তবে বুঝতে কষ্ট হয় না যে জল গভীর।

কমলা জ্বরে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লো।

রমেশ বলল, ঝি রইলো, ভিখন্ রইলো, তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি ডাক্তার ডেকে আনি।

আবার ডাক্তার কেন, এমন কী হয়েছে!

সেটা ডাক্তার এসে বুঝবে, বলে রমেশ বেরিয়ে গেল।

পাড়ায় খোঁজ করে জানালো যে ডাক্তার চক্রবর্তী সবচেয়ে বড় ডাক্তার। ডাক্তার চক্রবর্তীর ঠিকানা সংগ্রহ করে বাড়ীর দরজায় এসে দেখল, দেবনাগরী ও ইংরাজী অক্ষরে লিখিত "ডক্টর এন. চক্রবর্তী।"

ডাক্তারের ঘরে ঢুকে রমেশ চমকে ওঠে, আরে নলিনাক্ষ যে?

নলিনাক্ষ ডাক্তারও চমকে ওঠে, রমেশ তুমি কোত্থেকে?

সে অনেক কথা ভাই।

বসো বসো।

তার চেয়ে তুমি ওঠো, আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

নলিনাক্ষ উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, বিয়ে করেছ নাকি? কতদিন হল?

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করলো রমেশ, কেন, তুমি বিয়ে করোনি নাকি?

অপরের মুখে চোখে মনস্তত্ত্বের লীলা লক্ষ্য করবার মতো মনের অবস্থা রমেশের থাকলে সে দেখতে পেতো যে রমেশের প্রশ্নে নলিনাক্ষের মুখমণ্ডলে চকিতের মধ্যে একটা বিষাদের ছায়া খেলে গেল—

সে বলল, না, এখনো করা হয়নি।

গাড়ী করে দু'জনে চলেছে। অনেকদিন পরে দুই বন্ধুতে দেখা। বাল্যকালে রংপুরে ইস্কুলে দুইজন এক সঙ্গে পড়তো। তারপরে ছাড়াছাড়ি।

রমেশ বলল, তোমাকে পেয়ে পুনর্জীবলোকং প্রবিশামি। নতুবা একলা বিদেশে কি করতাম !

অন্য ডাক্তার দেখাতে।

ডাক্তার তো অনেক মেলে—কিন্তু বন্ধু পাই কোথায় ?

তারপরে শুধোয়, নিতান্ত সন্ন্যাস ব্রত যদি না নিয়ে থাকো তবে বিয়ে করে ফেলো, আর বিলম্ব করো না।

অন্য মনস্কভাবে সে উত্তর দেয়, না, আর বিলম্ব করবো না।

ঔষুধপত্রের ব্যবস্থা দিয়ে ডাক্তারা ফিরে গেলে কমলা বলল, আর ডাক্তার ডেকো না।

কেন বলো দেখি, রমেশ শুধায়।

কমলা উত্তর দিতে চায় না। অবশেষে অনেক পীড়াপীড়িতে বলে, কে কোথাকার একটা অপরিচিত মানুষ এসে গায়ে হাত দেবে, আমার ভালো লাগে না।

পাগল কোথাকার ? নাড়ী না দেখলে, বুক পরীক্ষা না করলে রোগ ঠাওরাবে কি করে ?

আর রোগ ঠাউরে দরকার নেই, বলে সে পাশ ফিরে শোয়।

রমেশ বলে,—লেডী ডাক্তার এসে আমার গায়ে হাত দিয়ে যদি পরীক্ষা করতো, সত্যি বলছি, আমার মন্দ লাগতো না ?

সে তো বুঝতেই পারছি। নিজের স্ত্রীর কাছে যাদের ঘেষতে ইচ্ছে করে না পরস্ত্রীর হাওয়া তাদের মধুর লাগবেই।

এই দেখো রাগ করলে তুমি? নলিনাক্ষ আমার বাল্যকালের

আমার সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ?

নিশ্চয়ই সম্বন্ধ আছে। তুমি রোগী, সে ডাক্তার।

থাক থাক। তাকে আর ডাকতে হবে না, আমি আদবে সহ্য করতে পারি না।

কি সহ্য করতে পারো না, লোকটাকে না তার ওষুধ।

ওষুধ তো এখনো খাইনি।

কেবল বাঁশী শুনেছ। বলে রমেশ।

নিজের স্ত্রীর সঙ্গে বুঝি এইভাবে ঠাট্টা করে, বলে কেঁদে ফেলে কমলা।

রমেশ এবারে সত্যই অপ্রস্তুত হয়—কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না প্রথম দৃষ্টিতেই নলিনাক্ষকে ভালো না লাগবার কারণ কী কমলার।

কমলা সুস্থ হয়ে উঠেছে, তবে আরও কিছুদিন ওষুধ খাওয়া দরকার। কমলার অনিচ্ছা থাকায় নলিনাক্ষকে আর বাড়ীতে নিয়ে আসেনি রমেশ, তার বাড়ীতে গিয়ে ওষুধপত্র নিয়ে আসে। সেদিন নলিনাক্ষর ঘরে ঢুকে রমেশ চমকে উঠল, হেমনলিনী ও অন্নদাবাবু।

একি রমেশ তুমি এখানে কোথা থেকে—শুধালেন অন্নদাবাবু।

নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছি।

কিন্তু ব্যাপার কি হে? সেই যে আসছি বলে চায়ের টেবিল থেকে উঠে গেলে তারপর এই ক'মাস পরে হঠাৎ এখানে দেখা।

ইতিমধ্যে অনেক কিছু ঘটে গিয়েছে আমার জীবনে তাই আপনাদের সংবাদ নিতে পারিনি।

এতক্ষণে সে হেমনলিনীর দিকে তাকালো, দেখলো, বসন্ত শেষের ফুল ঝরে যাওয়া মাধবীলতার মতো তার ক্ষীণ অবস্থা। ছোট একটি নমস্কার করে শুধালো, কেমন আছেন?

হেমনলিনী, বলে, ভালই আছি।

হেমনলিনীর প্রসাদ অর্জনের আশায় রমেশ বলল, ইতিমধ্যে আমার পিতার মৃত্যু হয়েছে।

বলো কি রমেশ!

শুধু তাই নয়—নৌকাডুবির দুর্ঘটনায় পরিবারের অন্যান্য কয়েকজন আত্মীয়ও ডুবে মারা গিয়েছেন বাবার সঙ্গে।

কেমন বাবা, আমি বলেছিলাম না যে একটা বড় রকমের বিপদ কিছু ঘটেছে—নইলে রমেশবাবুর তো এমন নীরব থাকা স্বভাব নয়।

তা বলেছিলে বটে মা।

অপ্রীতিকর প্রসঙ্গের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার আশায় রমেশ বলল, নলিনাক্ষ বুঝি আপনাদের পূর্ব পরিচিত?

অপূর্ব পরিচিত হে, অপূর্ব পরিচিত। এখানে বেড়াতে এসে হেম অসুস্থ হয়ে পড়েন, তখন থেকেই পরিচয়ের সূত্রপাত। ক'দিন বা—কিন্তু মনে হয় যেন কতকালের পরিচয়। দেবতুল্য লোক হে, দেবতুল্য লোক।

অন্নদাবাবুর মুখে নলিনাক্ষর এ হেন প্রশংসা কেন জানি রমেশের কানে কটু লাগলো।

হেমনলিনী বলল,—মনে হচ্ছে আপনারও ডাক্তারবাবুর সঙ্গে পরিচয় আছে?

অনেককালের পরিচয়—বলে প্রবেশ করলো নলিনাক্ষ। আপনাদের সঙ্গেও দেখছি রমেশের পরিচয় আছে?

অন্নদাবাবু বলেন, আছে বই কি? মাঝখানে ওঁর জীবনে কতকগুলি গুরুতর দুর্ঘটনা ঘটে গিয়েছে তাই সাময়িক ছাড়াছাড়ি হয়েছিল।

তারপরে বলেন, নিশ্চয় শুনেছেন যে, হঠাৎ নৌকাডুবিতে ওঁর পিতা ও আত্মীয়েরা ডুবে মারা গিয়েছেন।

চমকে উঠে নলিনাক্ষ বলে, কই আমাকে তো কিছু বলেনি। তাছাড়া এখানে এসেও তো বিপদ কম যাচ্ছে না। নিউমোনিয়ার মতো হয়ে পড়েছিল ওর স্ত্রীর?

স্ত্রীর? কার স্ত্রীর! অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে জড়িত প্রশ্ন করেন অন্নদাবাবু।

হেমনলিনী নীরব প্রশ্নে তাকায় রমেশের মুখে।

রমেশ সমস্ত সঙ্কোচ সমস্ত সন্দেহ দুই হাতে ঠেলে ফেলে দিয়ে বলে, আমার স্ত্রীর। ঐ দুর্ঘটনার মুখেই বিবাহ, তাই কাউকে সংবাদ দিতেও পারিনি।

অন্নদাবাবু গম্ভীর হয়ে রইলেন—কোন কথা বললেন না।

হেমনলিনী হাসবার চেষ্টা করে বলল, অভিনন্দন জানাবারও সুযোগ পেলাম না, রমেশবাবু। একদিন নিমন্ত্রণ করুন, আপনার স্ত্রীকে অভিনন্দন জানিয়ে আসি।

রমেশ বলল, তিনি আর একটু সুস্থ হয়ে উঠলেই আহ্বান করবো—যদি অবশ্য দয়া করে পায়ের ধুলো দেন!

অন্নদাবাবু সে কথার উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না, নলিনাক্ষকে লক্ষ্য করে বললেন—আমাদের সারনাথ দেখিয়ে আনবার কি হল?

বেশ তো চলুন না আজ বিকালেই। কিন্তু তার আগে রমেশকে বিদায় করে নিই।

ঔষধ ও ব্যবস্থা নিয়ে রমেশ যখন ফিরে রওনা হল, তার মনে হল তার মতো এমন নিঃসঙ্গ লোক সংসারে বুঝি আর দুটি নাই। সুখ দুঃখের অংশ গ্রহণের সঙ্গী যার নাই সেই সত্যকার হতভাগ্য।

কয়েকদিন পরে রমেশ দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়েছিল, হঠাৎ শুনতে পেলো—রমেশ যে, এসো, এসো।

অন্নদাবাবু ও হেমনলিনী।

আশা করি তোমার স্ত্রী সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

সুস্থ হয়ে উঠেছেন, কিন্তু এখনো সবল হননি, আরো কিছুদিন লাগবে।

হেমনলিনী বলল, তারপর আমাদের নিমন্ত্রণ করতে ভুলবেন না যেন।

নিশ্চয়ই নয়।

রমেশ, তোমার কি খুব তাড়া আছে? তবে বসো। দেখো রমেশ, এই কাশীর মতো জায়গায় এলে বুঝতে পারা যায় যে হিন্দু ধর্মটা এখনো সজীব।

রমেশ ভাবলো এ কথাটা ব্রাহ্ম অন্নদাবাবুর মুখে নতুন বটে। কতবার তাঁর কাছেই সে শুনেছে, হাঁ এক সময়ে প্রাচীনকালে উপনিষদের যুগে হিন্দুধর্মে প্রাণের লক্ষণ ছিল—কিন্তু আজ সমস্তই প্রাণহীন, সমস্তই নির্জীব।

দেখো গঙ্গার পবিত্রতা স্বীকার না করলেও তার ঐতিহ্য না মেনে তো উপায় নাই।

রমেশ ভাবলো, অন্নদাবাবুর এই অপ্রত্যাশিত পরিবর্তনের কারণ কি। কিন্তু বেশীক্ষণ ভাবতে হল না—শীঘ্রই রহস্যের কিনারা মিলল।

রমেশকে পাশে বসিয়ে অন্নদাবাবু বললেন, তোমাকে একটা সুখবর দিই। নলিনাক্ষবাবুর সঙ্গে হেমের বিবাহ স্থির হয়ে গিয়েছে।

সময়োচিত সঙ্কোচে হেমনলিনী মুখ নীচু করে রইলো।

এমন মানুষ হয় না হে, হোন হিন্দু, তবু একটা মানুষের মতো মানুষ।

রমেশ বলল—আজ্ঞে হাঁ, মানুষ হিসাবে নলিনাক্ষ সত্যি বড়।

তারপরে হেমনলিনীকে বলল, আপনাকে অভিনন্দন জানাবার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হলাম।

তাই বলে কমলা দেবীকে অভিনন্দন জানাবার সুযোগ থেকে যেন বঞ্চিত না হই।

অবশ্যই হবেন না, সেদিন আপনাদের তিনজনকেই নিমন্ত্রণ করবো।

রমেশ স্ত্রীর অসুস্থতার অজুহাতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো—গঙ্গার ঘাটের হাজার হাজার লোকের মধ্যে তার মতো অসহায় সেদিন আর কেউ ছিল না। নদীর এক কূল ভাঙ্গে, মানুষের ভাগ্য যখন ভাঙ্গে তখন একেবারে দুই কূল ভেঙ্গে পড়ে।

রমেশের আমন্ত্রণে হেমনলিনী ও অন্নদাবাবু এসেছেন, নলিনাক্ষ এখনো এসে পৌঁছায়নি। অন্নদাবাবু বলেছিলেন ডাক্তারের ঘড়ি চলে রুগীর সুবিধা অসুবিধা অনুসারে। তবে নলিনাক্ষ এলো বলে, সে বলল আপনারা এগোন, আমি আসছি।

অন্নদাবাবু ও হেমনলিনীর সঙ্গে পরিচয়ের কথা কমলাকে জানিয়েছিল রমেশ—আর সেই সঙ্গে জানিয়েছিল হেমনলিনীর সঙ্গে নলিনাক্ষর আসন্ন বিবাহের সংবাদ।

কমলা বলেছিল হেমনলিনী দেবীকে অভিনন্দন জানাতে মন সরছে না।

কেন বলো তো?

তোমরা যাই বলো, এই নলিনাক্ষ ডাক্তারকে আমার ভালো লোক মনে হয় না।

রমেশ হেসে উঠে বলেছিল—এ যে নতুন কথা। কাশীর লোকে তাকে একটা ছোটখাটো বিশ্বনাথ বলে মনে করে।

নকল বিশ্বনাথ ভক্তির পাত্র নয়।

রমেশ বলে, কমলা তোমার এই উষ্মার কারণ আজো বুঝতে পারলাম না। নলিনাক্ষর ওষুধগুলো কি খুবই তিতো?

তাদের এ তর্কের মীমাংসা হওয়ার নয়।

হেমনলিনী ও কমলা পাশাপাশি বসে সুখ-দুঃখের কথা বলছে। অল্প বয়সে সুখের কথাই বেশী।

কমলা দেবী, আপনার সৌভাগ্য যে রমেশবাবুর মতো স্বামী পেয়েছেন।

আর কাশীর লোকে একবাক্যে আপনাকে অভিনন্দন জানাবে নলিনাক্ষবাবুর মতো স্বামী লাভে।

কমলা মত বদলেছে কিনা জানি না তবে বলল তো ঐ রকম কথা।

মা কমলা তুমি আর একটু সুস্থ হয়ে উঠলে দু'জনে মিলে চুনারে যাও। ওরকম জলটি ভারতবর্ষে আর কোথাও পাবে না।

হেমনলিনী হেসে বলল—ঐ আরম্ভ হল বাবার জল আর হাওয়া।

হাওয়া তো এখনো আরম্ভ করিনি।

তবে আর আরম্ভ করে কাজ নেই।

আচ্ছা তবে থাক।

তারপরে রমেশকে লক্ষ্য করে বললেন, দেখো তোমাদের উপর দিয়ে দুর্ঘটনা কম যায়নি, কিন্তু ভেঙ্গে পড়লে চলবে না। এই দেখো না নলিনাক্ষ! তাকে দেখলে কি মনে হয় প্রকাণ্ড দুর্ঘটনার ঝড় বয়ে গিয়েছে তার উপর দিয়ে?

গিয়েছে নাকি, শুধায় রমেশ।

কেন, তোমাকে কিছু বলেনি?

না।

বাবা, সবাইকে তিনি ব্যক্তিগত দুঃখের কথা বলে বেড়ানো ভালো মনে করেন না।

তা বটে। তবে আমাকে বলেছে। অবশ্য আমাকে বলতেই হবে। আগের বিয়ের কথা চাপা দিয়ে বিয়ের প্রস্তাব করাতো উচিত নয়।

বিস্মিত রমেশ শুধায়—নলিনাক্ষ কি আগে একবার বিয়ে করেছিল নাকি?

করেছিল বই কি, তবে সে মেয়েটি জীবিত নেই।

মারা গিয়েছে? কি হয়েছিল?

ঐ যে বললাম দুর্ঘটনা!

কি ব্যাপার খুলে বলুন তো, বলে রমেশ।

এখানেও তাঁর মনুষ্যত্বের প্রকাশ, যিনি মানুষ হন তাঁর ষোল আনাই মানুষ। গোড়াতে ভেবেছিলেন বিয়ে করবেন না, দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করবেন। কিন্তু শেষে মায়ের চোখের জল আর সহ্য করতে পারলেন না, দেশে গিয়ে মাতুলালয়ে পালিত একটি গরীবের মেয়েকে হঠাৎ বিয়ে করে ফেললেন।

রুদ্ধশ্বাসে রমেশ শুধায়, তারপরে?

বধূকে নিয়ে ফিরবার পথে অতর্কিত কালবৈশাখীর মুখে পড়ে নৌকাডুবিতে মেয়েটি মারা গেল।

কমলার মুখের দিকে তাকাবার সাহস হল না রমেশের—জিজ্ঞাসা করলো এ কতদিন আগেকার কথা।

তা মাস তিনেক হবে।

হেমনলিনী বলল—বাবা ওঁদের বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছে না, বড়ই নাটকীয় মনে হচ্ছে।

বিশ্বাস না হলে চলবে কেন? মেয়ের নাম, তার মাতুলের নাম, গাঁয়ের নাম সমস্তই বলেছিল, এমন কি পুলিশের যে থানায় ফার্স্ট ইনফরমেশন দিয়েছিল তাও জানিয়েছে—নইলে হেম বিয়ে করতে রাজি হবে কেন?

পাহাড়ে পথে ঘুমের ঘোরে যেন চলেছে রমেশ—সে পথও বুঝি শেষ হয়ে এলো! শুধাল, গাঁয়ের নাম ?

সে এক বিচিত্র নাম শুনলে হাসি পায়— বলে হেমনলিনী।

অন্নদাবাবু বলেন—ধোবাপুকুর।

এই যে এসো এসো নলিনাক্ষ, তোমার কথাই হচ্ছিল—বলেন অন্নদাবাবু।

নলিনাক্ষ ঘরে ঢুকেই বলে উঠলো—একি, একি, উনি মূর্ছিত হয়ে পড়েছেন যেন।

কথাটা সত্য, কমলা মূর্ছিতা, কেউ লক্ষ্য করেনি।

এবারে সকলে সচেতন হয়ে উঠল—জল! পাখা! ওডি-কোলোন ?

নলিনাক্ষ রুগীকে ধীরভাবে পরীক্ষা করে বলল—ভয়ের কারণ নাই, শক পেয়েছেন।

কেন বাবা তুমি ঐ নৌকাডুবির ঘটনা বলতে গেলে, উনি সবে গুরুতর অসুখ থেকে উঠেছেন।

এমন যে হবে বুঝতে পারিনি মা।

একি, একি, রমেশ তুমি কাঁপছ কেন ?

রমেশ চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল, তখনি আবার ভেঙ্গে গিয়ে বসে পড়লো। সকলে দেখলো তার মুখ শাদা কাগজের মতো বিবর্ণ।

কুন্দনন্দিনীর বিষপান

কুন্দনন্দিনী বিষ খেয়েছে, সংবাদ পাওয়া-মাত্র সকলে তার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল, সূর্যমুখী, কমলমণি, নগেন্দ্রনাথ এবং আর আর সকলে। তারা দেখলো যে, ছিন্ন-লতিকার মতো সুন্দর দেহ ভূপতিত, শয্যায় নয় খালি মেঝের উপরে, পাশে শূন্য বিষের কৌটা। সূর্যমুখী অশ্রুনেত্রে বলে উঠল, বোন, এ-সর্বনাশ করতে গেলে কেন ?

কুন্দ বলল, দিদি, এ-সংসারে একজন লোক বেশি হয়ে গিয়েছে, তাই বারে বারে হিসাবে এমন গরমিল হচ্ছে। তুমি বিবাগী হয়ে বের হয়ে যাওয়ার পরে দেখা গেল যে, সংসার ভাঙে ভাঙে, কাজেই বুঝতে পারা গেল যে, সে অতিরিক্ত লোকটি তুমি নও। কাজেই আমি, তাই চলেছি।

বাক্‌কুণ্ঠিত সুন্দর মুখে এমন কথা শুনে সবাই অবাক হয়ে গেল, বুঝলো যে, সুন্দর মুখ দিয়ে সর্বজ্ঞ মৃত্যু কথা কইছে :

প্রখর বুদ্ধিমতী কমলমণি বুঝলো যে, হীরা বিষ জুগিয়েছে। হীরাকে কোথায়ও খুঁজে পাওয়া গেল না।

নগেন্দ্রনাথ পাষাণ মূর্তির মতো নীরবে দাঁড়িয়ে রইলো। সে ভাবছিল, সংসারে সুখের ব্যাপারে ভ্রম সংশোধন সম্ভব নয়। সূর্যমুখীতে সুখ নেই ভেবে কুন্দনন্দিনীকে দিয়ে ভ্রম সংশোধন করতে গিয়েই এই মহা-বিপত্তিটি সে বাধিয়েছে।

এমন সময়ে গাঁয়ের সরকারী ডাক্তারখানার ডাক্তারবাবু এসে উপস্থিত হলেন। কুন্দ বিষ খেয়েছে শুনবামাত্র কমল ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিল। ডাক্তারবাবুর বিদ্যা ফিভার

মিশ্চার বিতরণ অবধি। তিনি ঘরে ঢুকেই বললেন, কোন ভয় নাই ভগবানকে ডাকুন। ডাক্তার যখন ভগবানকে ডাকতে বলে আর বাঘে যখন ধান খায়, তখন বুঝতে হবে সত্যই দুঃসময়। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, মেডিকেল কলেজে আমরা যে-সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছি, তার কিছুই নেই এখানকার ডিসপেন্সারিতে, নতুবা এ-রুগী সারিয়ে তুলতে কতক্ষণ! বলা বাহুল্য, কলেজ স্ট্রীট দিয়ে যাতায়াত ছাড়া মেডিকেল কলেজের ধারে কাছেও তিনি যাননি।

সকলে যখন কুন্দর আরোগ্যের আশা ছেড়ে দিয়েছে, এমন সময়ে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত এক ব্যাপার ঘটলো। হেমচন্দ্র বসু নগেন্দ্রনাথের প্রতিবেশী, কলিকাতায় কর্ম করেন, কয়েক দিনের জন্য গ্রামে এসেছেন, সঙ্গে এসেছে তাঁর বন্ধু রমেশচন্দ্র নাগ, মেডিকেল কলেজের পাশ-করা বিচক্ষণ ডাক্তার।

তিনি ঘরে ঢুকে বললেন, নগেন্দ্রবাবু বিনা ডাকেই এলাম, দুঃসময়ে ডাকের অপেক্ষা করতে নেই।

তারপর রমেশবাবুকে দেখিয়ে বললেন যে, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, পাশ-করা অভিজ্ঞ ডাক্তার। যদি অনুমতি করেন তো ইনি একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন!

নগেন্দ্রনাথ বলল, বিলক্ষণ! এ আর বলতে। আপনাদের বিশেষ অনুগ্রহ যে, আপনারা এসেছেন।

রমেশবাবু বিষের কৌটা পরীক্ষা করে বললেন যে, আফিঙ ছিল, ভয় নেই, হয়তো পারবো।

তখন তিনি রোগিণীর মুখের ভিতরে নল চালিয়ে দিয়ে যথারীতি পাম্প করতে শুরু করলেন। আফিঙ তখনো রক্ত-স্রোতে মেশেনি, পাকস্থলীতেই ছিল, অল্পে অল্পে নিঃসারিত হতে লাগলো। এইভাবে দীর্ঘকাল পাম্প করবার পরে যখন শুধু জল উঠতে লাগলো, রমেশবাবু বললেন, যাক্ এবারের মতো

রক্ষা পেলেন। এবারে এঁকে আপনারা বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গরম দুধ পান করতে দিন, আর ভয়ের কারণ নেই।

তারপরে বললেন, আজকের দিন মুহ্যমান হয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু কালকেই বেশ সতেজ হয়ে উঠবেন।

এই বলে তিনি, হেমবাবু, নগেন্দ্রনাথ, সরকারী ডাক্তার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, রইলো কেবল মেয়েরা। বের হওয়ার আগে সরকারী ডাক্তার মন্তব্য করলেন, যন্ত্রে করে কাম, হয় মর্দের নাম, ওসব যন্ত্রপাতি পেলে আমিও পারতাম। ভারি তো ডাক্তার, কলকাতায় কেউ নামও জানে না।

॥ ২ ॥

কুন্দনন্দিনী সেরে উঠতেই নূতন সমস্যা দেখা দিল।

সূর্যমুখী বলল, কুন্দ আমার ছোট বোন, এই সংসারেই থাকবে।

নগেন্দ্রনাথ বলল, তা হতেই পারে না।

সূর্যমুখী শুধায়, তবে ঐ অসহায় মেয়ে কোথায় যাবে?

যেখানে সুবিধা বোধ করে যাক্, উচিত মাসোহারার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি।

ওর আর আছে কে যে, সেখানে যাবে।

সে দায়িত্ব আমার নয়।

সে কি কথা, ওকে তুমি কি বিয়ে করোনি?

ভুল করেছিলাম সূর্যমুখী।

তোমার ভুলের দায় ও কেন বহন করতে যাবে?

তর্কের মীমাংসা হয় না, হওয়ারও নয়। রূপের মোহ যখন ভাঙে, অবশিষ্ট থাকে মাংসপিণ্ড, তার বীভৎস চেহারা মানুষকে

ক্ষিপ্ত করে তোলে, সে অবস্থায় হত্যা, আত্মহত্যা কিছুই অসম্ভব নয় তার পক্ষে।

কুন্দনন্দিনী এখনো শয্যাশায়িতা, মাঝে মাঝে আসে সূর্যমুখী আর কমলমণি। আরো একটি পদধ্বনির আশায় হয়তো কুন্দ উৎকর্ণ কিন্তু সে পদধ্বনি আর বাজে না। সে একা একা শুয়ে ভাবে, সদয় মৃত্যুও তার প্রতি নির্দয়। বিষপান করে কঠিন সমস্যার সরল সমাধন সে করতে গিয়েছিল—তাও হল না তার ভাগ্যে।

চিন্তায় প্রবীণতা লাভ করলে সে বুঝতে পারতো সংসারে কঠিন সমস্যার সরল সমাধান সম্ভব নয়। কিন্তু সে এত বোঝে না, তাই শুয়ে শুয়ে কাঁদে। কোন কোন লোক সংসারে কাঁদতেই এসেছে। কুন্দ তাদেরই একজন।

দত্ত পরিবারের কঠিনতম সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো কুন্দনন্দিনী। যে নগেন্দ্রনাথ একদিন তার রূপে মুগ্ধ হয়ে সূর্যমুখীকে উপেক্ষা করে তাকে বিবাহ করেছিল আজ সে বিরূপ। আর যে সূর্যমুখী আত্ম-ধিক্কারে নিজ হাতে গড়া সংসার ত্যাগ করেছিল—আজ সে-ই হচ্ছে কুন্দর একমাত্র নির্ভর। সংসারে এ-ও এক বিচিত্র হের-ফের।

ভবিতব্যের হাত কখন যে পাশায় কী দান নিক্ষেপ করবে তা কেউ বলতে পারে না।

অবস্থা যখন বেশ জটিল হয়ে উঠেছে তখন কমলমণি বলল, দাদা, বৌদি, শোন, তোমরা ধীরে সুস্থে বসে সমস্যার সমাধান করো। আমি আপাতত কুন্দকে নিয়ে কলকাতায় চললাম।

নগেন্দ্রনাথ ও সূর্যমুখী একযোগে বলে উঠল—সে কী!

এ ছাড়া তো উপায় নেই। মেয়েটা তো পথে পড়ে মরতে পারে না।

নগেন্দ্রনাথ বলল, কিন্তু শ্রীশবাবুর তো মত নেওয়া চাই।

দাদা আমাদের সংসারে স্বামীস্ত্রীর দুই মত নয়!

কথাটা নগেন্দ্র ও সূর্যমুখী দুজনকেই বিঁধলো। দুজনেই দীর্ঘনিশ্বাস চেপে ভাবল তাদের সংসারেও একদিন এই রকম ছিল।

কমলমণির যে কথা সেই কাজ। দিন তিনেকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে নিয়ে সে কলকাতা রওনা হল। যাওয়ার সময় বলে গেল—দাদা, বৌদি, তোমাদের মতে মিল হলে ওকে আনিয়ে নিয়ো—আমি চিরকাল ওকে আটকে রাখতে চাইনে।

কলকাতা যাওয়ার প্রস্তাবে কুন্দ আপত্তি করেননি। সে সূর্যমুখীকে প্রণাম করে প্রস্তুত হল। আশা করেছিল এই উপলক্ষ্যে একবার নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। কিন্তু কুন্দর সে আশা সফল হল না। বিদায় কালে নগেন্দ্রনাথ দুটো কথা বলা দূরে থাক দেখা পর্যন্ত করলো না।

নগেন্দ্রনাথ, তুমি বড় দুর্বল।

॥ ৩ ॥

কমলমণিদের কলকাতার বাড়িতে মাঝে মাঝে বিদ্যাসাগর মশায় আসেন। যেদিন তাঁর শুভাগমন হয় কর্তা-গিন্নি-শিশু এবং ঝি-চাকরের ভেদ দূর হয়ে যায়, বিদ্যাসাগরের কাছে সকলেই সমান, কারণ তিনি সকলের চেয়ে অনেক বড়। কমলমণি গোড়াতে তাকে মামাবাবু বলে ডাকবার চেষ্টা করেছিলেন, তাতে তিনি বলেছিলেন, দূর মাগী আমি হলেম গিয়ে কিনা তোর বাপের শালা। তার চেয়ে পিসেমশাই বল্ না কেন। তাই পিসেমশাই ডাকাটাই চালু হল। আগে কমলমণির শিশুপুত্র সতীশ তাঁর কাছে ঘেষত না। বর্ণপরিচয় নামে যে পুস্তিকাখানি তার সকাল সন্ধ্যার ত্রাস ঐ ব্যক্তি তার লেখক। এমন লোকের কাছে

থেকে দূরে থাকাই নিরাপদ—বানান জিজ্ঞাসা করতে কতক্ষণ। কিন্তু অল্পদিনেই চুম্বকের টানে তাকে ধরা দিতে হল। এখন সে বিদ্যাসাগরের বড় অনুরক্ত, এলে ছাড়তে চায় না।

কমল বলে এখন যা তো ওঁকে একটু জিরোতে দে।

সতীশ বলে আমি কি দাদুর সঙ্গে কুস্তি করছি—ঐ তো জিরোচ্ছেন।

বিদ্যাসাগর বলেন—হল তো। তারপরে বলেন জানিস কমল এই ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে আমার বেশ মিল হয়—কিন্তু বড় হয়ে উঠলেই দূরে দূরে থাকে।

কমল বলে আপনাকে ভয় করে কিনা।

সতীশ শুধায়, দাদু তুমি যেমনটি গল্প করছ তেমন লেখ না কেন ?

তাও লিখিরে বড় হলে পড়বি।

কবে বড়ো হব শুধায় সতীশ।

আর দেরী নেই, হলি বলে।

তারপর থেকে বিদ্যাসাগর এলেই সতীশ শুধাতো দাদু বড় হয়েছি কি ?

বিদ্যাসাগর তাকে দুই হাতে উঁচু করে ধরে তুলে বলতেন এই তো বড় হয়েছিস।

তোমার চেয়েও ?

নইলে আর বড় কি ? জানিস দাদু বাংলা দেশে এক তুই ছাড়া আর কেউ আমাকে বড় বলে স্বীকার করে না।

নিজের বুদ্ধিমত্তার স্বীকৃতি সতীশ গম্ভীর ভাবে শোনে। কিন্তু বিস্মিত হয় পিতামাতার ব্যবহারে। তারা এমন হেসে উঠল কেন ? কেন বিদ্যাসাগর কি বড় নয়, সতীশ কি বুদ্ধিমান নয় ?

সেদিন বিদ্যাসাগর মশায় এলে কমলমণির ইঙ্গিতে কুন্দনন্দিনী এসে তাঁকে প্রণাম করলো। তিনি আগে কখনো তাকে দেখেননি,

জিজ্ঞাসু নেত্রে কমলমণির দিকে চাইলেন। কুন্দ প্রস্থান করলে শুধালেন, কমল, এই মূর্তিমতী করুণাটি কে?

কমল ধীরে ধীরে কুন্দর জীবন বৃত্তান্ত বিবৃতি করলো। সমস্ত কথা শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ থেকে তিনি বললেন, কমল, মানুষের ভালো করবো বল্লেই ভালো করা যায় না—তার সমস্যা বড় জটিল। এই দেখ্ না কেন, আমি বিধবা বিবাহ সমর্থন করি আবার বহু বিবাহ সহ্য করতে পারিনে। এই একটি মেয়ের জীবনে দুটো পরীক্ষাই হয়ে গেল, এক সঙ্গে বিধবা বিবাহ আর বহু বিবাহ। বিষফল তো ফললো।

কমল কুণ্ঠিতভাবে বলে, অমৃত ফলও তো ফলতে পারতো।

নারে না, যেখানেই ফলুক এখানে ফলবে না, এ যে বিষবৃক্ষের দেশ। এখন মনে হচ্ছে বঙ্কিমের কথাই ঠিক।

এতক্ষণ যেন তিনি স্বগত উক্তি করছিলেন, এবারে সম্বিত পেয়ে বললেন—এখন তুই কি করবি মেয়েটাকে নিয়ে।

তাই তো ভাবনায় পড়েছি পিসেমশাই, স্বামীর সংসারে ওর যে আর স্থান হবে আশা হয় না।

সেদিন কথাটা ঐ পর্যন্ত হয়ে রইলো। কয়েক দিন পরে তিনি এসে বললেন, দেখ্ কমল, ঐ মেয়েটার মুখ মনে পড়ে ক'রাত ঘুমোতে পারিনি। কি গতি হবে ঐ কচি মেয়েটার। আচ্ছা কমল ওকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করে দে না কেন, মদনের দুই মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালা পড়ে সেখানে। তোদের বাড়ীর গাড়ি করে পৌঁছে দেবে আবার নিয়ে আসবে। কি বলিস?

কমল বল্ল—এর আবার বলাবলি কি, আপনার হুকুম। এই কি যথেষ্ট নয়!

বিদ্যাসাগর তার মাথায় হাত দিয়ে বললেন, নারে পাগলি না, হুকুম হাকিমের লোক আমি নই। লেখাপড়া শিখলে কোন বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরী করে খেতে পারবে।

খেতে কি আর আমরা দিতে পারিনে পিসেমশাই?

তোরা দিতে পারিস, কিন্তু ও নেবে কেন? পরের গলগ্রহ হওয়ার মতো জ্বালা আর নেই রে।

ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাবে কুন্দ আপত্তি করলো না, ভাবলো অহোরাত্রিব্যাপী দুঃখের হাত থেকে খানিকটা সময় রক্ষা পাওয়া যাবে তো। তারপরে কখনো যদি ভগবান প্রসন্ন হন ভালোই, নতুবা কোথাও কোন বালিকা বিদ্যালয়ে চাকুরী করে জীবন কাটিয়ে দেবে।

সে ভাবে মানুষের জীবন কতই বা দীর্ঘ, অর্ধেক তো কেটেই গেল।

কুন্দনন্দিনী বেথুন স্কুলে ভর্তি হল।

॥ ৪ ॥

সূর্যমুখী নগেন্দ্রনাথকে প্রায়ই বলে থাকে, যা হওয়ার তা হয়েছে। এবার কুন্দকে আনিয়ে নাও।

নগেন্দ্র বলে, না তা হয় না।

না হওয়ার কারণ কি। আমি তো আপত্তি করছি না।

ওকে বিয়ে করবার সময়েও তো তুমি আপত্তি করোনি।

আপত্তি করলেও তুমি করতে।

এখনো তাই, আপত্তি না করলেও আমি আনবো না। সেবারেও তোমার অবাধ্য হয়েছিলাম, এবারেও হব। সূর্যমুখী, তার চেয়ে এক কাজ করো ওকে মাসে মাসে কিছু করে টাকা পাঠিয়ে দিয়ো।

সূর্যমুখী বলে, যে স্বামীর ঘর করতে পারলো না স্বামীর টাকা সে নেবে কেন? আর কমলমণির কি টাকার অভাব আছে?

তা ছাড়া, ছবার আমি টাকা পাঠিয়েছিলাম কমল ফেরত পাঠিয়েছে, লিখেছে কুন্দ টাকা নিতে অস্বীকার করেছে।

আমাকে বলোনি কেন?

বল্‌লেই বা কি করতে।

তা বটে বলে চুপ করে যায় নগেন্দ্রনাথ।

সংসারের ঘটনাগুলো পেন্সিলের লেখা হলে রবার ঘষে তুলে দেওয়া সম্ভব হতো, এ যে সুগভীর কালির আঁচড়, কাটতে গেলে আরো ধেবড়ে যায়। নগেন্দ্রনাথের কুন্দ-ঘটিত মনস্তত্ত্ব কী ঠিক জানিনে। কিন্তু একদিন যেমন অন্ধ অনুরাগ অনুভব করেছিল তার প্রতি, আজ তেমনি এক প্রকার অন্ধবিদ্বেষ অনুভব করে তার প্রতি। যে সূর্য আলোতে সব উজ্জ্বল করে তোলে, সময় বিশেষে সেই সূর্যোদয়েই কুয়াশায় সব আচ্ছন্ন হয়ে যায়।

একদিন সূর্যমুখী বল্‌লে, শুনেছ কুন্দ বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছে।

ভালোই হয়েছে, বলে নগেন্দ্রনাথ, আমার টাকা না নেয় কোথাও শিক্ষয়িত্রীর কাজ করে খেতে পারবে।

তারপরে বলে, কিন্তু হঠাৎ বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দিল কে?

স্বয়ং বিদ্যাসাগর মশায়।

বিদ্যাসাগরের নামে নগেন্দ্র গম্ভীর হয়ে যায়। বিধবা কুন্দকে বিবাহ করবার আগে তাঁর নাম যেমন কানে সুধা ঢেলে দিত— এখন তেমনি বিষবিন্দু বর্ষণ করে।

সেদিন আর কথা জমে না।

ওদিকে বেথুন বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে কুন্দ মনে মনে ভারি আরাম পাচ্ছে। প্রথম প্রথম খুব লজ্জা করতো, বয়স বেশি, বিবাহিত। শেষে লক্ষ্য করলো যে তার চেয়েও বেশি

বয়সের মেয়ে অনেক আছে, আর অনেকে যে শুধু বিবাহিত তা-ই নয়, ২।৩ ছেলের মা, একজন তো রীতিমতো শাশুড়ী, নাকে নথ দিয়ে, গালে পান গুঁজে, দোক্তার কৌটা হাতে, হাতি পাড় শাড়ী পরে আসে। মদনমহন তর্কালঙ্কারের মেয়ে ভুবনমালা ও কুন্দমালার সঙ্গেই তার প্রথম পরিচয় হয়—কিন্তু তারা কেমন মুখচোরা, আলাপ বেশি দূর এগোয়নি।

কমলমণি ভাবে লেখাপড়া হোক না হোক ঐ নিয়ে মেতে থাকবে, ঐ টুকুই লাভ। কিন্তু লেখাপড়ার একটা নিজস্ব আকর্ষণও তো আছে—ক্রমে কুন্দ সেই আকর্ষণে মেতে উঠ্‌লো আর বছরের পরে বছর পরীক্ষাগুলো ভালভাবেই পাশ করে যেতে লাগলো।

এই সময়ে একদিন কমলমণির মুখে শুনলো যে সূর্যমুখীর একটি পুত্র সন্তান হয়েছে। সেদিন আর পড়াশুনায় তার মন লাগলো না। বুকের মধ্যে কেমন একটা মোচড় অনুভব করলো, সে কি ঈর্ষার না স্নেহের ক্ষুধায় বুঝতে পারে না সে। শুধু বোঝে দু চোখে জলধারার আর বিরাম নেই। নগেন্দ্রনাথের কথা কি তার মনে পড়ে না? অবশ্যই পড়ে। রূপকথায় শুনেছিল সে, মায়াপুরীর উত্তর দিকের জানলাটা খুলতে নিষেধ ছিল রাজকন্যার, খুললেই নাকি মহা বিপদ। সেই থেকে মনের উত্তর দিকের জানলাটা সে খোলে না, সে দিকে নাকি নগেন্দ্রনাথের স্মৃতি। খোলে না বটে, কিন্তু কখনো কখনো ফাঁকফোকর দিয়ে তাকিয়ে দেখে, তখনি চোখ নামিয়ে নেয়—একি আলোর ঝলমলানি, সমস্ত আকাশটা যেন উচ্চ সুরে আহত বীণার তন্ত্রের মতো কাঁপছে। তখনি দ্বিগুণ উৎসাহে চারু-পাঠের হুরুভুজের ও পাশুপাদপের রহস্যের কাছে আত্মসমর্পণ করে। সহ্য করতে পারে না সে সীতার বনবাস। যে দুঃখ নিজ মনে সে চেপে রেখেছে বাল্মীকি সীতার বেনামে তাই লিখে গিয়েছেন নাকি?

তবে তার কেবলি মনে পড়ে মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার উক্তি—
"হে দারুণ বিধি, কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?"
মানুষ নিজের দায় দায়িত্ব ভগবানের উপরে চাপিয়ে স্বস্তি অনুভব করে। আর কোন কারণে না হোক—অন্তত এই জন্যেও ভগবানের অস্তিত্বের আবশ্যক আছে।

অবশেষে বেথুন বিদ্যালয়ের পড়া কুন্দর সমাপ্ত হল, শেষ পরীক্ষাটি কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করলো সে। সেই সুসংবাদটি, এক হাঁড়ি সন্দেশ আর ইংরাজি বাংলা অনেকগুলি বই নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন বিদ্যাসাগর মশায়।

সতীশ এখন বড় হয়েছে, আগে হলে সন্দেশের হাঁড়িটা ধরে টান দিতো, তার বদলে এখন সে একখানা ইংরাজি বই ওল্টাতে লাগলো।

বিদ্যাসাগর জিজ্ঞাসা করলেন, বুঝতে পারছিস? পাছে বানান জিজ্ঞাসা করে ভেবে সতীশ বলল, না।

বুঝবি কি করে তোর মনটা যে হাঁড়ির মধ্যে। নে খোল্।

আনন্দ সন্দেশ বিতরণের পালা শেষ হলে বিদ্যাসাগর বললেন—শ্রীশচন্দ্র, কুন্দর তো পড়া শেষ হল, এবার ওকে কোন বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করে দিই—কি বলো।

শ্রীশচন্দ্র স্বল্পভাষী লোক, সংসারে কথা বলবার দায়িত্ব কমলমণির উপরে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত আছে। তাই বিদ্যাসাগরের প্রশ্নের উত্তরে কমলমণির দিকে চাইলো।

সে কি পিসেমশায়, মেয়েছেলে আবার পড়াবে, সে কি কথা?

কেন, ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধ করতে পারলো আর কুন্দ ছোট ছোট মেয়েদের পড়াতে পারবে না!

একা একা কোথায় থাকবে?

বিদ্যালয় তো বনের মধ্যে হয় না যে, একা থাকবে। আর

একা থাকতে না হয় অস্থানে না পড়ে সে দায়িত্ব তো আমার। কি বল কুন্দনন্দিনী রাজি তো? বিদ্যালয়ের কাছেই ছোট একটি বাসা ঠিক করে দেবো, একটি ঝি নিযুক্ত করে দেবো—কেমন? ছুটি হলে চলে আসবে কলকাতায়। কি বলো?

কুন্দ তখনি রাজি—তবু বলল দিদি যা বলেন…

কমলমণি বলল আমি কি পিসেমশাইর উপরে কথা বলতে পারি!

কুন্দনন্দিনীর চাকুরি করতে যাওয়াই স্থির হল।

এত দুঃখের মধ্যে কুন্দর আনন্দের অবধি নেই। ছোট একটি বাসা হবে, বিশ্বস্ত ঝি হবে, পরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে হবে না, নিজের সংসারে কর্তৃত্ব করবে—এ কি কম সুখের কথা। যদিচ সংসারে প্রধান উপাদানটারই অভাব, শিবহীন যজ্ঞ—তবু তো যজ্ঞ বটে। কুন্দ বিদায় নেবার সময় বলেছিল, দিদি সংবাদটা গোবিন্দপুরে জানিয়ো না, ওঁরা লজ্জা পাবেন। কমল সে অনুরোধ রক্ষা করে নি, সূর্যমুখীকে সব জানিয়েছিল।

॥ ৫ ॥

প্রকাণ্ড একটা জংশন স্টেশনের প্রশস্ত প্ল্যাটফরমে একটি সুবেশ সুন্দর বালক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। ক্রমে সে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষাগারের সম্মুখে এসে পড়লো, ঘরের বাইরে একরাশ পোঁটলা পুঁটলি বিছানা বাক্স ইত্যাদি স্তূপীকৃত। হঠাৎ একটি বাক্সের উপরে ইংরাজি হরফে লিখিত "মিসেস নগেন্দ্রনাথ দত্ত"। নগেন্দ্রনাথ দত্ত তার পিতার নাম, তবে কি ঐ নামে আরও লোক আছে! তার ভারি মজা লাগলো।

প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষাগার থেকে মাকে টেনে নিয়ে এলো,

দেখো মা, কেমন মজা, বাবার নামে আরো লোক আছে। মা বলল তা এমন আর আশ্চর্য কি, এক নাম কি দু'জনের হয় না ?

তবু দেখবে চলো ।

এই দেখো "মিসেস নগেন্দ্রনাথ দত্ত" অর্থাৎ নগেন্দ্রনাথ দত্তর পত্নী।

তারপরে বলল আমি ভাবতাম তুমিই একমাত্র "মিসেস নগেন্দ্রনাথ দত্ত।"

সূর্যমুখী পড়লো নামের নীচে ইংরাজিতে লিখিত আছে "হেড মিসট্রেস।"

সূর্যমুখীর আগেই সন্দেহ হয়েছিল যে কুন্দনন্দিনী, "হেড মিসট্রেস" দেখবার পরে আর সন্দেহ রইলো না, আর বুঝলো কাছেই কোথাও সে আছে।

তখন সূর্যমুখী বলল—নরেন, তুই ওয়েটিং-রুমে যা, মালপত্র সব আলগা পড়ে আছে, আর দেখিস তোর বাবাকে জাগাসনে। আমি এক্ষুনি আসছি।

নরেন দূরে যেতেই সে তৃতীয় শ্রেণীর প্রতীক্ষাগারে ঢুকলো আর ঢুকেই দেখতে পেলো একটি বেঞ্চিতে কুন্দনন্দিনী একাকী উপবিষ্ট।

অপ্রত্যাশিত ভাবে সূর্যমুখীকে দেখে বিস্মিত কুন্দ "দিদি এখানে তুমি"—বলে এগিয়ে এসে প্রণাম করলো।

সূর্যমুখী কিছু বলতে যাচ্ছিল, অন্তরায় হল বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ। সূর্যমুখীর চোখে জল গড়াতে লাগলো। ভাগ্যিস ঘরে তখন আর যাত্রী ছিল না।

দিদি চোখের জল মোছো—হঠাৎ কেউ এসে পড়লে কি ভাববে।

বলল বটে কিন্তু কারো চোখের জল তো থামলো না। চোখের জল বড় অবুঝ।

দিদি তোমরা কোথায় চলেছ ?

তীর্থ করতে গিয়েছিলাম—এখন বাড়ী ফিরছি। কুন্দর সাহস হল না জিজ্ঞাসা করে সঙ্গে আর কে আছে।

তুমি কোথায় যাচ্ছ কুন্দ ?

পূজোর ছুটির শেষে ইস্কুলে ফিরে চলেছি, এখানে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠ্‌বো।

এমনি করেই কি জীবন কাটাবে ?

জীবন তো কেটেই গেল দিদি—বয়স তো কম হল না।

সূর্যমুখী এবারে চেয়ে দেখলো নিটোল সুডোল শিশির বিন্দুটির মতো তার মুখমণ্ডল তেমনি উজ্জ্বল, তেমনি করুণ, তেমনি পবিত্র। মনে মনে সে স্বীকার করলো কুন্দ সুন্দরী। স্ত্রীলোকে যখন স্ত্রীলোকের সৌন্দর্য স্বীকার করে তখন বুঝতে হবে কিছু অসাধারণ।

কুন্দ তুমি কি আমাদের ভুলে গিয়েছ ?

এই আমাদের শব্দ কাদের বোঝায়, বিশেষ করে কাকে বোঝায় এ বিষয়ে দুই পক্ষের কারো মনে সন্দেহ ছিল না।

কুন্দ বলল, ভুলিনি দিদি কেবল ছাই চাপা দিয়ে রেখেছি।

তবে ওঁকে একবার ডাকি।

কুন্দর বুকের ভিতরে স্বপ্নের প্রাসাদ ভূমিকম্পে নড়ে উঠল। কিন্তু তখনি আত্ম সম্বরণ করে বলল, না, না দিদি তোমার পায়ে পড়ি।

এমন সময়ে কুলি মাথায় পাগড়ী জড়াতে জড়াতে এসে বলল মাউজি গাড়ীর টাইম হইয়ে গেল।

চল্ বাবা, মালগুলো মাথায় নে।

তারপরে নত হয়ে সূর্যমুখীর পায়ের ধুলো নিয়ে বলল আসি দিদি। নরেনকে আশীর্বাদ জানালাম (সূর্যমুখীর ছেলের নাম কমলমণির পত্রে জেনেছিল)।

এই বলে অবিচলিত পদে কুলীর পিছু পিছু ছোট লাইনের গাড়ীর দিকে চল্‌ল—একবারও পিছে ফিরে তাকাল না।

সূর্যমুখী কিছুক্ষণ সেদিকেই তাকিয়ে রইলো, তারপরে চোখ মুছে রওনা হল প্রথম শ্রেণীর প্রতীক্ষাগারের দিকে। এমন সময় শুনতে পেলো একটা তীক্ষ্ণ তীব্র এঞ্জিনের বাঁশী—বুঝলো ছোট লাইনের গাড়ী ছেড়ে চলে গেল।

প্রতীক্ষাগারে পৌঁছতেই পাছে পিতার ঘুম ভাঙ্গে পাশ ফিরে মৃদুস্বরে নরেন শুধালো, ও কে মা?

সূর্যমুখীর কণ্ঠের কাছ অবধি এসেছিল "তোমার ছোট মা"—কিন্তু তখনি সেটা গিলে ফেলে বল্‌ল—চিনিনে। এক নামে কি ছু'জন লোক হয় না?

নরেন বলল—সে কথা তো আমি আগেই বলেছিলাম।

রক্তাতঙ্ক

তারিণীবাবুর অদৃষ্ট সত্যই মন্দ। তাঁহার বড় ছেলেটি অকালে মারা গেল, মেজোটি পাগল হইল, আর ছোটটি কম্যুনিষ্ট হইয়া গেল। এখন তাঁহার ভরসা কন্যা প্রতিমার উপরে। তাঁহার একটিমাত্র মেয়ে। তারিণীবাবু লোকের কাছে বলিতেন একটি মাত্র সন্তান।

তারিণীবাবুর অবস্থা ভালো নয়, তৎসত্ত্বেও স্থির করিলেন মেয়েকে উচ্চশিক্ষা দিতে হইবে। কারণ, উচ্চশিক্ষার ফলে শুধু ভালো বিবাহ হইবার সম্ভাবনা নয়, কিছু কিঞ্চিৎ জ্ঞানার্জনও হয় বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস। প্রতিমা ম্যাটিকুলেশন পাশ করিলে তারিণীবাবু তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়া একটি স্বাস্থ্যকর ছাত্রীনিবাসে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কলিকাতায় পড়িতে ও থাকিতে প্রচুর খরচ, কিন্তু তিনি স্থির করিয়াছেন যে, তাঁহার একমাত্র সন্তানের জন্য চূড়ান্ত ত্যাগ করিতে দ্বিধা করিবেন না। তাঁহার আর কেই বা আছে। প্রতিমার জননী অনেকদিন হইল গত হইয়াছেন।

প্রতিমা ছাত্রীনিবাসে একা পড়িল। ইতিপূর্বে সে কখনো বাড়ী ছাড়িয়া থাকে নাই, অপরের সহিত মিশিবার শক্তি তাহার ছিল না, ইচ্ছাও করিত না, কাজেই সে নিতান্ত নিঃসঙ্গ অনুভব করিত। কলেজের সময়টা এক রকমে কাটিত, কিন্তু ছাত্রীনিবাসে ফিরিয়া আসিয়া তাহার সময় আর কাটিতে চাহে না। একটা কিছু পড়িতে বসে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই আর সেই অক্ষর দেখিতে পায় না, চোখের জল চোখের দৃষ্টি অবরুদ্ধ করিয়া ঝরিতে থাকে।

সে তখন বই ফেলিয়া দিয়া বালিসে মুখ গুঁজিয়া কাঁদে। ছাত্রী-নিবাসের অধ্যক্ষা বারান্দা দিয়া যাতায়াত করিতে তাহাকে ওই অবস্থায় দেখিয়া বলেন, মেয়েটি বড় কুড়ে, কেবলি ঘুমায়।

প্রতিমার ঘরে আরও দুইজন ছাত্রী আছে। কিন্তু তাহাদের সঙ্গে এখনো তাহার ঘনিষ্ঠতা হয় নাই, প্রথমতঃ তাহারা দুইশ্রেণী উপরে পড়ে, দ্বিতীয়তঃ, তাহারা প্রায় সারাদিন বাহিরে ঘোরে, রাত্রে যখন ঘরে ফিরিয়া আসে, প্রতিমার তখন মধ্যরাত্রি। কিন্তু দুঃখীর স্বপ্নেও সুখ নাই। প্রায়ই সে বাড়ীর স্বপ্ন দেখে আর কাঁদে।

এমন সময়ে এক ঘটনা ঘটিল। একদিন রাত্রে ছাত্রীনিবাসের ছাদের উপরে শব্দ শুনিয়া মেয়েরা জাগিয়া উঠিয়া চীৎকার সুরু করিল, ছাত্রীনিবাসের অধ্যক্ষা অর্থাৎ মেয়েদের মাসিমার চীৎকার সকলকে ছাড়াইয়া গেল। কেহ কেহ বলিল—চোর, কেহ বলিল ডাকাত, প্রতিমার গৃহসঙ্গিনীদ্বয় একবাক্যে বলিল—ব্ল্যাক মার্কেটার।

মাসিমা শুধাইল—ব্ল্যাক্‌মার্কেটার এখন কেন আসতে যাবে?

পূর্বোক্ত ছাত্রীদ্বয় বলিল—ওদের তো অন্ধকারেই কারবার।

কিন্তু আগন্তুক যে-ই হোক মেয়েদের চীৎকারের মাত্রা বাড়িতেই থাকিল। ছাত্রীনিবাসে সবশুদ্ধ তেইশটি প্রাণী—কিন্তু কেহ চীৎকার শুনিলে বলিত যে, অন্ততঃ তেরোশ' লোকে চীৎকার করিতেছে। মেয়েদের শক্তি কণ্ঠে!

এতক্ষণ প্রতিমা চুপ করিয়াছিল, এবারে সে বলিল—মাসিমা, বেড়াল বা আর কিছু হবে।

এই বলিয়া সে একটা টর্চ লইয়া ছাদের দিকে অগ্রসর হইল। যে যেখানে বসিয়াছিল সেখান হইতেই বলিল—যেয়ো না, যেয়ো না, প্রাণে মারা পড়বে।

বলা বাহুল্য, তাহার প্রাণনাশের আশঙ্কায় কাহারো উদ্বেগ নয়, পাছে প্রতিমার আবিষ্কারের ফলে ভয় পাইবার সুযোগ নষ্ট

হয়, সেই জন্যই যা কিছু ব্যস্ততা। প্রতিমা সিঁড়ির দরজাটা খুলিতেই গোটা দুই বেড়াল হুড়-হুড় করিয়া নামিয়া দৌড় মারিল। প্রতিমা হাসিয়া উঠিল, আর সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল, এবার আর ভয়ে নয়—রাগে, প্রতিমার উপরে। মাসিমা রাগিয়া বলিলেন—এমন মেয়ে এখানে থাক্‌লে আমি আর পারবো না। সকলে যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গেল।

প্রতিমার সঙ্গিনীদ্বয় প্রতিমাকে বলিল—ভাই তোমার কিন্তু খুব সাহস!

প্রতিমা বলিল—আমি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, আমাদের অত ভয়-ডর থাক্‌লে চলে না।

পূর্বোক্ত দুইজন বলিল—কালকে তোমাকে এক জায়গায় নিয়ে যাবো। তোমার মতো মেয়ের আমাদের দরকার।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ভাব হইয়া গেল। মেয়েদের মন জলের মতো, অনায়াসে পরস্পরে মিশিয়া যায়। পুরুষের মন জল-জমা বরফ, পরস্পরের স্পর্শে ঠোকাঠুকি লাগিয়া কেবলি সংঘাত বাধাইতে থাকে।

॥ ২ ॥

পরদিন প্রতিমাকে লইয়া তার দুই সঙ্গিনী লীলা ও রমা বাহির হইল। তাহারা কলেজে না গিয়া অন্যপথ ধরিল এবং কিছুক্ষণ চলিয়া একটি গলির মধ্যে একটি জীর্ণ দোতলা বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। দোতলায় উঠিয়া প্রতিমা দেখিতে পাইল, একটি জলচৌকির উপরে সিন্দুরলিপ্ত কি দুইটি বস্তু রাধা-কৃষ্ণের মতো পরস্পরকে প্যাঁচ কষিয়া দণ্ডায়মান। প্রতিমা তাহাদের কোন ঠাকুর দেবতা মনে করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত

করিল। অমনি লীলা ও রমা হা-হী করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রস্তুত প্রতিমা শুধাইল, ভাই হাসলে কেন?

তাহারা বলিল, তোমার ভক্তি দেখে।

প্রতিমা বলিল, কেন ঠাকুর-দেবতাকে কি ভক্তি করতে নেই?

রমা বলিল, ও কি ঠাকুর-দেবতা?

লীলা বলিল, ঠাকুর দেবতাকে আবার ভক্তি কি?

রমা বলিল, সে তর্ক এখন নয়! কিন্তু ও দু'টো কি জানো না? কাস্তে আর হাতুড়ি।

অবাক হইয়া প্রতিমা শুধাইল—ওখানে কেন?

—তবে শোনো, বলিয়া রমা আরম্ভ করিল, আমরা সোভিয়েট কি না! ও দু'টো আমাদের প্রতীক।

সোভিয়েট বলিতে বা কি বুঝায়, তাহাদের প্রতীক বলিতে বা কি বুঝায়, প্রতিমা কিছুই বুঝিতে পারিল না। তখন রমা ও লীলা দ্বৈত বক্তৃতায় প্রতিমাকে বুঝাইতে সুরু করিল—মার্কসবাদ, বৈজ্ঞানিক বস্তুবাদ, সোভিয়েটের আদর্শ ইত্যাদি। এসব বস্তু সম্বন্ধে বলা বাহুল্য, তাহাদের জ্ঞান অতিশয় ক্ষীণ! কিন্তু হোমিও-প্যাথি ঔষধ ও আদর্শবাদ—যতই dilution-এ বাড়ে ততই তাহাদের ক্ষমতাও বাড়ে। তাহাদের দুইজনের অভিজ্ঞতা এই যে, এই রকম একটি বক্তৃতার পরেই মেয়েরা কম্যুনিষ্ট হইয়া পড়ে, ছেলেদের পক্ষে গোটা তিনেক বক্তৃতার প্রয়োজন হয়। কিন্তু অবোধ প্রতিমা, গ্রাম্য প্রতিমা কম্যুনিষ্ট হইবার কোন লক্ষণ দেখাইল না। রমা ও লীলা আশা ছাড়িল -না, প্রতিমাকে কাস্তে-হাতুড়ির মহিমা বুঝাইবেই। আশা যেখানে একমাত্র অবলম্বন—আশা ছাড়িলে সেখানে কি আর অবশিষ্ট থাকে?

তাহারা মেসের দিকে রওনা হইল। পথে দেখিতে পাইল মিশ্র বয়সের একটি জনতা লাল নিশান লইয়া আওয়াজ তুলিয়া.

চলিয়াছে। তাহাদের হাতে লাল শালুখণ্ডে লিখিত—'রুটি চাই, প্রগতি চাই, আলু চাই।'

প্রতিমা শুধাইল—ওরা কে?

লীলা বলিল—ওরা আমাদের লোক, মানে সোভিয়েট।

প্রতিমা শুধাইল—ওরা রুটি চায় কেন? ওরা তো ভাত খায়।

রমা বলিল—অবশ্যই ভাত খায়, আর কি খাবে। তবু রুটি কথাটা শোনায় ভালো। আমাদের দেশে—মানে রাশিয়ায় কেউ তো ভাত খায় না।

আমাদের দেশের ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রতিমার মাথায় সব তাল-গোল পাকাইয়া গেল।

তাহারা মেসে ফিরিয়া আসিল। বাড়ীতে ঢুকিতেই গেটের সামনে দেখিতে পাইল, তাহাদের সার্বজনীন মাসিমা অর্থাৎ মেসের সুপারিনটেনডেণ্ট দারোয়ানকে ধমকাইতেছেন—টিউবওয়েলটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আর বাগানটা আগাছায় ভর্তি হয়ে গেল! অথচ দারোয়ান এ-পর্যন্ত মিস্ত্রি ও মজুর আনতে পারল না।

দারোয়ান বলিল—সামনে হোলির পরব হোলি পার না হলে লোক পাওয়া যাবে না! মাসিমা হোলির পর দিনই যাহাতে মিস্ত্রি মজুর আসে তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন। প্রতিমা সঙ্গিনীদ্বয়ের সঙ্গে ঘরে ঢুকিল।

তারপর হইতে অবসর পাইলেই (কলেজ জীবনে বিশেষ মেসা-শ্রয়ী কলেজী ছাত্রদের জীবনে ইচ্ছা করিলেই অবসর পাওয়া যায়) রমা ও লীলা প্রতিমাকে কম্যুনিজম্ তত্ত্ব বুঝাইত। কি করিয়া তাহারা কম্যুনিষ্ট হইল, কম্যুনিষ্ট হইলে কি কি সুবিধা, অচিরেই সারা দেশটা কম্যুনিষ্ট হইয়া যাইবে, তখন দেশে রোগ-শোক আধি-ব্যাধি, রুটি ও ছুটির অভাব থাকিবে না, বড় লোকেদের বাড়ী, ধনীদের গাড়ী, জমিদার-তালুকদারদের জমিজমা কি ভাবে সমস্তই

শ্রমিক ও শ্রমিক-নেতাদের হাতে আসিবে—এই সব রমণীয় তত্ত্ব প্রতিমা বসিয়া বসিয়া শুনিত। লোকের জমিজমা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে শুনিয়া প্রতিমার বড় ভয় করিত—কারণ কয়েক বিঘা জমির উপরেই তাহাদের সংসারের নির্ভর। জমি বাজেয়াপ্ত হইলে বৃদ্ধ বয়সে তাহার পিতার কি অবস্থা হইবে, পড়াশুনা করিতে না পারিলে তাহারই বা গতি কি হইবে ভাবিয়া প্রতিমার রাত্রে ঘুম হইত না। সে মনে মনে কালি, দুর্গা প্রভৃতি শক্তিময়ীদের আহ্বান করিয়া নিবেদন করিত যে, মা, তোমরা সকলে মিলিয়া 'লাল বন্যা'-কে আর কিছুকাল আটকাইয়া রাখো।

'লাল বন্যা' কথাটা সে সঙ্গিনীদের কাছে শিখিয়াছে।

কিশোরী মেয়েদের উপরে প্রথম যখন লালের ছোপ পড়ে তখন তাহাদের বড় মনোরম দেখায়—বৈশাখের প্রথমে ডঁশা আমের গায়ে লাল আভা ফুটিবার মতো মনোরম। তখন তাহাদের চুলগুলি একটু উস্কু-খুস্কু হয়, মন একটু উড়ু-উড়ু হয়, হৃদয় একটু দুরু-দুরু হয়, বুক একটু নবগুরু হয়, সে এক অভূতপূর্ব উদ্‌ভ্রান্তি। তখন তাহাদের চোখ দুইটি মরীচিকার স্রোত সন্ধান করে, আঁচল, নিচোল এবং মাথার চুল শাসন মানিতে চায় না। তখন প্রত্যেক যুবককে রাজপুত্র এবং কর্পোরেশনের ময়লাটানা প্রত্যেক ঘোড়াটিকে পক্ষিরাজ বলিয়া মনে হইতে থাকে। এই অবস্থাকে বৈষ্ণব কবিগণ পূর্বরাগ বলিতেন, এখন বলা হয় কম্যুনিজম্‌। সেকালের রাধিকা একালের কম্যুনিষ্ট মেয়েদের পূর্বগামিনী। রাধিকার যে ভাবগতিক তাহাতে তিনি একালে জন্মিলে যে ধর্মঘটের একজন নেত্রী হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ, রাধা ও কৃষ্ণের কাহিনী বৈজ্ঞানিক দ্বন্দ্ববাদের একটি মনোহর রূপক ছাড়া আর কিছুই নয়। রাধা 'থিসিস্‌', কৃষ্ণ 'এন্টি-থিসিস্‌' আর এই দুইয়ের 'সিন্থেসিস্‌' হইতেছে হৃদি-বৃন্দাবন। এই হৃদি-বৃন্দাবনের চরম অবস্থা যেখানে হোলির রঙে লাল সেখানে ভাবাবেশে বুলেট চলিতে থাকে।

॥ ৬ ॥

একদিন রমা ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—প্রতিমা মুহ্যমান অবস্থায় বসিয়া আছে। রমা শুধাইল, ভাই কি হয়েছে?

প্রতিমা বলিল, বাবা চিঠি লেখেছেন যে প্রজারা খাজনা দিতে চাইছে না। তা হলে আমাদের কি হবে ভাই?

তাহার দুঃখে দুঃখিত হওয়া দূরে থাকুক, রমা উল্লাসে চীৎকার করিয়া উঠিল, লীলা, হয়েছে, হয়েছে!

তাহার চীৎকারে লীলা আসিয়া শুধাইল, কি হয়েছে?

রমার মুখে সব শুনিয়া দুই জনে যুগপৎ আওয়াজ তুলিল, 'সব লাল হো যায়গা।'

তার পরে প্রতিমার প্রতি তর্জনী নাড়িয়া বলিল, তোমাদের ক্যাপিটালিস্টদের আর রক্ষা নেই।

সঙ্গিনীদের কাছেও সহানুভূতি পাইল না দেখিয়া প্রতিমা নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অনুভব করিল এবং প্রাণ ভরিয়া কাঁদিবার উদ্দেশ্যে স্নানের ঘরে গিয়া ঢুকিল।

রমা ও লীলা তাহাকে প্রায়ই সোভিয়েটের জয়যাত্রার সংবাদ শুনাইত। তাহারা কোনদিন বলিত, আজ চেকোশ্লোভাকিয়া লাল হল, আজ জুগোশ্লাভিয়া লাল হল। কখনো বলিত, আব্দুল গফর খাঁর 'লাল কোর্তা' সোভিয়েট লাল রঙে রাঙানো।

প্রতিমা গোপনে মানচিত্র খুলিয়া এই সব দেশ দেখিত, আর সোভিয়েটের নৈকট্য উপলব্ধি করিয়া হাপুস নয়নে কাঁদিত। মানচিত্রে ও মানস চিত্রে সবই বড় ঘনিষ্ঠ দেখায়।

একদিন রমা আসিয়া বলিল, কমলপুরে মদ তৈরি করবার ঢালাও হুকুম দিয়ে এলাম, ওরা সবাই কম্যুনিষ্ট হবে বলেছে।

উত্তরে লীলা বলিল, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নে কাজ করা সহজ,— বিচারের সুযোগ পাওয়া যায়—কিন্তু ভাই পাকিস্থানে কিছুই করা যাচ্ছে না। ওরা একেবারেই গণতান্ত্রিক নয়! কমরেড গণেশকে সেদিন একশো মুসলমান লাঠি হাতে তাড়া করেছিল, শেষে বেগতিক দেখে নমাজ পড়ে উদ্ধার পায়!

রমা বলিল—কমরেড গণেশ ভুল করেছিল। পার্টির সিদ্ধান্ত কি মনে নেই? ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের ভদ্রতার সুযোগ নিয়ে গণ-তন্ত্র ধ্বংস করতে হবে। বাধা দিলে বলতে হবে—গণতন্ত্রে তোমাদের বিশ্বাস নেই। ছাড়া পেলেই আবার কাজ সুরু করতে হবে। 'So Simple!' পাকিস্থান, আফগানিস্থান প্রভৃতি ইস্লামি রাষ্ট্রে এ চালাকি চলবে না! ওরা আমাদের চেয়েও বড় কম্যুনিষ্ট!

প্রতিমা এইসব আলাপ শুনিত আর ভয়ে জড়সড় হইত— ভাবিত, রমা ও লীলা কম লোক নয়, নিশ্চয় ছদ্মবেশী কমিসার (কথাটা সঙ্গিনীদের কাছেই শিখিয়াছে), আর কম্যুনিজম তো আসিল বলিয়া! তখন তাহার ও তাহার বৃদ্ধ পিতার কি দশা হইবে!

দুঃখে ও আশঙ্কায় প্রতিমা কলেজে যাওয়া ছাড়িয়া দিল— ঘরেই ম্রিয়মাণ অবস্থায় বসিয়া থাকিত।

সেদিন হোলি। কলেজ ছুটি। প্রতিমা বাহির হয় নাই। বারান্দায় দাঁড়াইয়া দেখিল দলে দলে হাজারে হাজারে লোক লালরঙ মাখিয়া উন্মত্তভাবে চলিয়াছে। তাহার বোধ হইল—এরা সমস্তই কম্যুনিষ্ট, সে ভাবিল— সমস্ত শহর কম্যুনিষ্ট হইয়া ক্ষেপিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছে—আর রক্ষা নাই।

বিকাল বেলা সর্বাঙ্গ রক্তবর্ণ হইয়া রমা ও লীলা ঘরে প্রবেশ করিল, প্রতিমাকে বলিল, আর ভয় নেই, কাল ফোর্টউইলিয়াম দুর্গের উপরে কাস্তে-হাতুড়ির পতাকা উড়িবে। তাহারা আরও

জানাইল যে, আজই মন্ত্রিমণ্ডল বদল হচ্ছে—দেশ কম্যুনিজম গ্রহণ করেছে—আর দু'চার দিনের মধ্যে সোভিয়েট মুল্লুক থেকে একজন কমিসার আস্‌ছেন—জমিদার, তালুকদারদের জমিজমা বাজেয়াপ্ত করবার উদ্দেশ্যে!

এই বলিয়া তাহারা পরস্পরকে 'লাল সেলাম' জানাইল।

সে রাত্রে প্রতিমা আহারাদি করিল না। রাত্রে বিষম স্বপ্ন দেখিল! সে দেখিল—একটি লাল গাইয়ে চড়িয়া বিশ হাত লম্বা সোভিয়েট কমিসার তাহাদের গ্রামে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাহার ইঙ্গিত মাত্রে একদল লাল পোষাক পরা লোক কাস্তে-হাতুড়ি লইয়া তাহাদের জমিতে ঢুকিয়া পড়িয়া সব দখল করিয়া লইল, আর সে তাহার পিতার হাত ধরিয়া পথে বাহির হইল। সে বুঝিল তাহাদের সম্মুখে অনাহার ও অনাশ্রয়।

দুঃস্বপ্নের জন্য তাহার ঘুম ভাঙিতে বিলম্ব হইয়াছিল। ঘুম ভাঙিবা মাত্র শুনিতে পাইল—দারোয়ান উদাত্ত কণ্ঠে হাকিতেছে —আসছে, আসছে!

কে আসিতেছে? সেই স্বপ্নদৃষ্ট লাল পল্টন কি? দেখিবার উদ্দেশ্যে প্রতিমা ছুটিয়া বারান্দায় গিয়া উপস্থিত হইল। যাহা দেখিল, তাহাতে মাথা ঘুরিয়া উঠিল—বুঝিল স্বপ্ন তবে মিথ্যা নয়।

সে দেখিতে পাইল—লাল পোষাক পরিহিত দুইটি লোক একজনে হাতুড়ি, অপর জনে কাস্তে লইয়া গেট দিয়া প্রবেশ করিতেছে।

সে বুঝিল—ওই তো স্বপ্নদৃষ্ট লাল ফৌজ! ওই তো সোভিয়েটের চিহ্ন কাস্তে-হাতুড়ি! তাহার মনে হইল—তবে তো রমা ও লীলার কথা মিথ্যা নয়। সে দেখিল যে ওই লাল সেপাই তাহাকে ধরিবার জন্যই আসিতেছে, তাহার পিতা নিশ্চয় এতক্ষণ কারাগারে। সে আর ভাবিতে পারি না! মাথা ঘুরিয়া পড়িল গেল। প্রতিমা মূর্ছিতা!

নীচে হইতে দারোয়ানের কণ্ঠে শ্রুত হইল, মাইজি, মিস্ত্রি আর মজুর এসেছে ?

মাসিমার কণ্ঠে শ্রুত হইল, বেটারা হোলির পোষাকটা অবধি ছাড়বার সময় পায়নি! হয় তো বা এখনো গায়ে তাড়ির গন্ধ আছে।

মূর্ছিতা প্রতিমা আরও কি ভীষণ বিভীষিকা দেখিতে লাগিল কেমন করিয়া বলিব!

রক্তবর্ণ শৃগাল

এক বনে দগ্ধমুখ নামে এক শৃগাল বাস করিত। সে একদিন রাত্রে নিকটবর্ত্তী জনপদে আহার অন্বেষণে গিয়াছিল। সেদিন সে কাহার মুখ দেখিয়া উঠিয়াছিল জানি না! সমস্ত জনপদ ভ্রমণ করিয়া কোন আহার্য্য বস্তু পাইল না। যখন সে ফিরিয়া যাইবে মনঃস্থ করিয়াছে এমন সময়ে কয়েকটি কুকুর তাহাকে দেখিতে পাইয়া তাড়া করিল। সে পথ ভুলিয়া পালাইতে লাগিল এবং লাফ দিয়া পালাইবার সময়ে একটি বৃহদাকার পাত্রের মধ্যে পড়িল। ঐ পাত্রের মধ্যে পরদিন হোলি খেলিবার উদ্দেশ্যে গৃহস্বামী আবির গুলিয়া রাখিয়াছিল। দগ্ধমুখ লালরঙের মধ্যে পড়িয়া আপাদমস্তক রক্তবর্ণে রঞ্জিত হইয়া গেল। যখন সে উঠিল কুকুরগুলি তাহাকে আর চিনিতে পারিল না, তাহারা ফিরিয়া গেল। দগ্ধমুখ নিরাপদে বনে ফিরিয়া আসিল।

সকাল বেলায় দগ্ধমুখ এক জলাশয়ে জলপান করিতে গিয়া নিজের ছায়া দেখিয়া চমকিয়া উঠিল! একি! ওই লাল জন্তুটা কি? ওটা কে? জলের মধ্যে ও কোথা হইতে আসিল? সে ভাবিল জন্তুটা তাহার অনুকরণ করিতেছে কেন? দগ্ধমুখ লেজ নাড়িল— লাল জন্তুটারও লেজ নড়িল। ইহার অর্থ কি? অনেকক্ষণ পরে সে বুঝিতে পারিল—ওটা অপর কোন জন্তু নয়—তাহারই ছায়া। সে আগাগোড়া রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে। সে ভয়ে লজ্জায় জলপান না করিয়া ফিরিয়া আসিল।

তখনো ভালো করিয়া আলো হয় নাই, বন্য জন্তুগণ সারা রাত্রি শিকার সন্ধান করিয়া অধিকাংশই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কাজেই কেহ

দগ্ধমুখের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইল না। এই সুযোগে দগ্ধমুখ পালাইয়া আসিয়া একটি ভাঙ্গা ইটের পাঁজার মধ্যে লুকাইয়া থাকিল। অনাহারে ও তৃষ্ণায় সে কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। সে ভাবিতে লাগিল—এখন কি উপায় ?, কি ভাবে এই রক্ত তুলিয়া ফেলিয়া সে পুনর্ব্বার স্বাভাবিক বর্ণ ফিরিয়া পাইবে চিন্তা করিতে থাকিল। হঠাৎ তাহার মনে হইল, জলে ধুইলেই তো রঙ উঠিয়া যাইবে—এত ভাবনা কিসের ? তখন তাহার মন অনেকটা প্রফুল্ল হইল। সে রাত্রি হইবার আশায় বসিয়া রহিল। রাত্রি হইলে সে পুর্ব্বোক্ত জলাশয়ের নিকটে গিয়া জলে নামিয়া আচ্ছা করিয়া স্নান করিল। তারপরে তীরে উঠিয়া নিজের ছায়া দেখিয়া হতাশ হইয়া বসিয়া পড়িল। রঙ ওঠে নাই—একেবারে পাকা রঙ। বরঞ্চ জলে লাফালাফি করিয়া জৌলুষ যেন আরো বাড়িয়াছে। দগ্ধমুখ বলিল—হায় ভগবান ! এই সে প্রথম ভগবানকে ডাকিল। তখন সে আবার গিয়া ইঁটের পাঁজাটিতে লুকাইয়া রহিল।

কিন্তু এমন ভাবে অনাহারে এবং স্বজন-বিরহিত অবস্থায় কতদিন লুকাইয়া থাকা চলে ! তাই সে তাহার পরবর্ত্তী কর্ম্মপদ্ধতি চিন্তা করিতে লাগিল। সে নিশ্চয় বুঝিতে পারিয়াছিল তাহার লাল রঙ উঠিবে না, কাজেই রঙটাকে স্বীকার করিয়া লইয়া তাহার সহিত মিলাইয়া নিজের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা করাই যে বুদ্ধিমানের লক্ষণ তাহা সে বুঝিতে পারিল। কিন্তু নিঃসঙ্গের তো ভবিষ্যৎ নাই—অতএব প্রথমে একটি দল সংগ্রহ করা আবশ্যক। সে যদি একদল শৃগালকে রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিয়া ফেলিতে পারে—তবে একটা কর্ম্মপদ্ধতি আবিষ্কার করা কঠিন হইবে না।...কিন্তু দলবল সংগ্রহ করিবার কি উপায় ? সে ভাবিল বুদ্ধিমানের উপায়ের অভাব কি ? দগ্ধমুখের উন্নতির সমস্ত দ্বার নিত্য অবারিত।

পরদিন সকালে দগ্ধমুখ শৃগাল সমাজের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। কেহ তাহাকে চিনিতে পারিল না, কেহ কেহ বা তাড়িয়া

মারিতে গেল। দগ্ধমুখ তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিল—কমরেডগণ আমাকে চিনিতে পারিতেছ না? আমি যে তোমাদের কমরেড দগ্ধমুখ। তখন সকলে তাহাকে চিনিতে পারিয়া বলিল—তোমার এ দুর্দ্দশা হইল কেন?

দগ্ধমুখ হাসিয়া বলিল—দুর্দ্দশা! বলো সৌভাগ্য! রক্তবর্ণে রঞ্জিত হওয়াই নূতন হুকুম। আজ আমি লাল হইয়াছি, কাল তুমি লাল হইবে, ক্রমে সমস্ত জানোয়ার সমাজ লাল হো জায়গা!

অন্য শৃগালেরা শুধাইল, কিন্তু লাল হইতে যাইবে কেন?

দগ্ধমুখ বলিল—শোন কথা একবার! ইহাই তো স্বভাবের নিয়ম। বয়স হইলে যেমন নখ ও দাঁত ওঠে, তেমনি এই লাল রঙও বয়সের লক্ষণ! আর দেখো—এই লাল রঙ ধারণ করিবার পরে আমার দৃষ্টি-শক্তি কত বাড়িয়া গিয়াছে, তোমাদেরও বাড়িবে —একবার আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া দেখো। কিন্তু কোন শৃগালই তাহার দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিল না তাহারা চলিয়া গেল।

দগ্ধমুখ কয়েকটি শৃগালীকে ডাকিয়া বলিল—তোমরা যখন গেলে না বুঝিতে পারিতেছি, শৃগালদের চেয়ে তোমাদের বুদ্ধি অনেক বেশী। শৃগালীরা এই স্তোকবাক্যে খুশী হইল। কোন্ শৃগালী না হয়! বুদ্ধি বেশী শুনিয়া একমাত্র নির্ব্বোধেই খুশী হয়।

শৃগালীরা শুধাইল ভবিষ্যৎ অতীত ছাড়িয়া দাও, লাল রঙ গ্রহণ করিলে আমাদের সৌন্দর্য্য কি বাড়িবে?

দগ্ধমুখ বিস্মিত হইয়া বলিল—বাড়িবে না? কি যে বলো? এই দেখো না, আমার লেজটি দেখোনা! আগে কটা রঙ্গএর ছিল—লেজটাকে নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ হইত। আর এখন দেখো না কেন! —এই বলিয়া সে লেজটি বার কয়েক নাড়িল!

শুধাইল—কেমন ভালো নয় কি? কেমন চামরের মতো

ছুলিতেছে, কেমন ক্ষণে ক্ষণে ফুলিতেছে ! এমন কি মানুষেরা অবধি এই লেজের জন্য আমার কাছে উমেদার হইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি দিই নাই—তোমাদের দেখাইবার জন্য রাখিয়া দিয়াছি। ইচ্ছা করিলে তোমরাও লেজের রঙ্গ লাল করিয়া লইয়া জীবন ধন্য করিতে পারো।

সৌন্দর্য্যের আশায় শৃগালীদের মন ভিজিল। কোন্ শৃগালীর মন না ভিজে। সৌন্দর্য্য বাড়িবে ভাবিয়া তাহারা গায়ে উল্কি পরে, চোখে কাজল পরে, পায়ে আলতা পরে, গুটি পোকা মারিয়া রেশম তৈয়ারী করিয়া সর্ব্বাঙ্গে শাড়ী পরে।

শৃগালীরা বলিল—দাও, দাও, আমাদের লাল লেজ দাও। আমাদের সৌন্দর্য্য বাড়িলে, আমরা রক্তলাঙ্গুলের অধিকারী হইলে—"সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব" আমরা লোকনিন্দায় গ্রাহ্য করি না।

দগ্ধমুখ বলিল—তোমরাই পারিবে। এস আমার সঙ্গে এসো।

দগ্ধমুখ আগেই অনেকটা লাল রঙ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল। একটা ডোবার জলে ফেলিয়া সে লাল করিয়া তুলিল। তারপরে শৃগালিনীদের বলিল—তোমরা নামিয়া স্নান করো। শৃগালিনীগণ নামিয়া স্নান সারিয়া তীরে উঠিলে দগ্ধমুখ বলিল—এবার জলে নিজ নিজ ছায়া অবলোকন করো। শৃগালিনীগণ নিজেদের ছায়া দেখিয়া উচ্চৈস্বরে বাহবা বাহবা রব করিয়া উঠিল। পরস্পরকে ডাকিয়া তাহারা বলিতে লাগিল—আচ্ছা আমার লেজটি দেখো, আরে আমার লেজটি দেখো, যেন পলাশ ফুলের ঝাড়, যেন শিমুল ফুলের ডাল ! কাহার লেজ অধিকতর সুন্দর তাহা লইয়া নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা পড়িয়া গেল। এ বলিল—আমার লেজ, ও বলিল আমার লেজ, সে বলিল—আমার লেজ, সকলেই বলিল—তাহার নিজের লেজ ! প্রত্যেকে অপরকে বলিল—দেখো আমার লেজটি কেমন নড়িতেছে—যেন ঢাকের পিঠের পালকের সাজ !

তখন তাহার বলিল—চলো আর দেরি নয়, সমাজে গিয়া সকলকে আমার লেজটি দেখাই! দগ্ধমুখ বলিল—সেই ভালো, কিন্তু যাইবার আগে সকলে একবার লাল সেলাম করো। তখন তাহারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া দগ্ধমুখের ইঙ্গিত অনুসারে লেজ নাড়াইয়া লাল সেলাম করিল এবং এক দৌড়ে লাঙ্গুল প্রদর্শনের আশায় পশু সমাজে গিয়া উপস্থিত হইল।

এই ঘটনার পর হইতে দগ্ধমুখের কাজ অনেকটা সহজ হইয়া আসিল। শৃগালীগণ রক্তবর্ণ ধারণ করিলে শৃগালগণের মন টলিল। শৃগালীগণ শৃগালদের লক্ষ্য করিয়া বলিত, শাদা শেয়ালের স্থান আমাদের কাছে নয়।

শিয়ালরা বলিত, আমাদের রং কটা, শাদা নয়। শৃগালীরা বলিত, যাহা লাল নয়, তাহাই শাদা। জগতে দুটি বই রং নাই।

তাহারা আরও বলিত, আমাদের লেজগুলি কেমন তাজা লাল তোমরা লাল হইলে কেবল যে আমাদের সঙ্গ পাইবে তাহাই নয়, আমাদের মতো একটি করিয়া লাল লেজ পাইবে। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখিয়া শিয়ালগণ রক্তদহে স্নান করিয়া রক্তবর্ণ শৃগালে পরিণত হইল। শৃগালীগণ তাহাদের রূপান্তর দেখিয়া সানন্দে লেজ নাড়িয়া তাহাদিগকে লাল সেলাম জানাইল। লাঙ্গুলের প্রভাবে কিনা হয়! লাঙ্গুল আলাদিনের প্রদীপ। সর্ব্বত্র লাঙ্গুলের জয়।

সমস্ত শৃগাল লাল বর্ণ ধারণ করিলে দগ্ধমুখের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল। শৃগাল সমাজকে একটা মাঠের মধ্যে সমবেত করিয়া দগ্ধমুখ জ্বালাময়ী ভাষায় বলিতে আরম্ভ করিল—কমরেডগণ, আমরা রক্তবর্ণ শৃগাল! আমরা অন্য সব জন্তু হইতে স্বতন্ত্র! অন্য সব জন্তুদের দিকে চাহিয়া দেখো তাহারা এখনও অতীতের জের টানিয়া চলিতেছে, আর আমরা এক নূতন সভ্যতা ও নূতন মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছি। পশু-সমাজের বর্ত্তমান দুর্দ্দশার কারণ

আর কিছুই নহে, এই যে ভূখণ্ড পৃথিবী নামে যাহা পরিচিত, তাহাকেই সবাই আপন দেশ বলিয়া মনে করে। কিন্তু এই পচা ও প্রাচীন পৃথিবী আমাদের দেশ নহে, আমাদের দেশ চাহিয়া দেখ, আমাদের দেশ ওই ঊর্দ্ধে স্বর্গীয় প্রভায় জ্বল জ্বল করিতেছে। ওই দেখো—বলিয়া দগ্ধমুখ ঊর্দ্ধে ইঙ্গিত করিল।

রক্তবর্ণ শৃগালের দল আকাশের দিকে চাহিল। আকাশে তখন পূর্ণচন্দ্র দেদীপ্যমান ছিল। সকলে বুঝিল ওই চন্দ্রই তাহাদের দেশ। এতকাল পৃথিবীকে দেশ মনে করিবার জন্য তাহারা লজ্জা অনুভব করিতে লাগিল। সকলে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিল—আহা কমরেড দগ্ধমুখের কি বুদ্ধি!

দগ্ধমুখ বলিল—এখন হইতে ওই চন্দ্রকে নিজের দেশ মনে করিবে—রক্তবর্ণ শৃগাল অন্য দেশ মানে না।

তারপর সে বলিল—আমাদের দেশ কি জানিলে, এখন আমাদের কর্ত্তব্য কি জানিতে হইবে। সিংহ, গণ্ডার, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বলবান পশুগণ ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল পশুগণকে 'এক্সপ্লয়েট' করে, তাহাদের ঠকাইয়া খায়, কাড়িয়া খায়, মারিয়া খায়, এই অনাচার আর চলিতে দেওয়া যায় না। জগতের এইসব দুর্ব্বল পশুর রক্ষক আমরা! তাহাদের স্বার্থ রক্ষাই আমাদের কর্ত্তব্য। বিশেষ করিয়া পশুরাজ সিংহের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান করিতে হইবে। তাই বলিয়া অবশ্য আমরা সিংহের বিরুদ্ধে হাতে কলমে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইব না। কেবল পথের মোড়ে মোড়ে চোঙা মুখে দিয়া 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাউক' 'চন্দ্রবাদ প্রতিষ্ঠিত হউক' বলিলেই আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে।

সকলে দগ্ধমুখের নিরাপদ রণ-কৌশল শুনিয়া বলিয়া উঠিল—আহা, কমরেড দগ্ধমুখের কি বুদ্ধি!

তখন দগ্ধমুখ বলিল—তোমরা যাইবার আগে একবার আমাদের দেশের উদ্দেশ্যে লাল সেলাম জানাও।

অমনি শৃগালকুল রক্তবর্ণ লাঙ্গুল নাড়িয়া বলিয়া উঠিল 'লাল সেলাম।' বাতাসে যেন লক্ষ চামর জ্বলিয়া উঠিল।

তারপরে তাহারা প্রস্থান করিল এবং ইঁদুর, ছুঁচো, আরশোলা প্রভৃতি দুর্ব্বল জন্তুদের রক্ষাকর্ত্তা সাজিয়া তাহাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিয়া শৃগাল-শৃগালী নির্বিশেষে চায়ের দোকানে বসিয়া সহ-ভোজন করিতে লাগিল।

এই সময়ে, কয়েকদিন পরে অন্য বন হইতে একটি প্রবল হস্তী আসিয়া সিংহকে আক্রমণ করিল। সিংহ বনের পশুদের ডাকিয়া বলিল—তোমরা আমার সহায় হও। অনেক পশু রাজি হইল। কিন্তু দগ্ধমুখ রাজি হইল না।

সিংহ শুধাইল—তোমার আপত্তি কেন ?

দগ্ধমুখ বলিল—এ যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদের লড়াই, আমরা সাহায্য করিব কেন ?

সিংহ বলিল—হাতীটা এই বন অধিকার করিয়া তোমাদের উপর অত্যাচার করিবে না কি ?

দগ্ধমুখ বলিল—তাহাতে আমাদের অবস্থার তারতম্য কি ঘটিবে ? এখন তুমি অত্যাচার করিতেছ, তখন না হয় হাতী করিবে।

সিংহ বলিল—আমার জন্য না হয় নাই করিবে কিন্তু তোমার দেশ আক্রান্ত হইয়াছে বলিয়াও কি সাহায্য করিবে না ?

দগ্ধমুখ বলিল—দেশ ? আমার দেশ কোথায় ? আমার দেশ ওই দেখো।

এই বলিয়া সে আকাশের চাঁদটিকে দেখাইয়া দিল।

দগ্ধমুখের কথা শুনিয়া সিংহ হাঁ করিয়া বসিয়া রহিল, এমন অদ্ভুত কথা সে জীবনে শোনে নাই। সিংহকে হতবাক দেখিয়া দগ্ধমুখ প্রস্থান করিল এবং দলবল লইয়া পথের মোড়ে চোঙা মুখে 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাউক' ধ্বনি করিতে লাগিল।

এদিকে হাতীর আক্রমণে সিংহের দুর্দ্দশা উপস্থিত। তাহার রাজ্য ও প্রাণ যাইবার মুখে। যত অকিঞ্চিৎকর হোক না' কেন সকলেরই সাহায্য তাহার আবশ্যক। কাজেই সে নিরুপায় হইয়া আবার দগ্ধমুখকে ডাকিয়া পাঠাইল।

তাহাদের মধ্যে কি আলোচনা হইয়াছিল তাহা অদ্যাবধি প্রকাশ পায় নাই—তবে লোকে গাড়ী গাড়ী টাকার থলি দগ্ধমুখের বিবরের দিকে যাইতে দেখিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। অর্থ, স্বার্থ ও পরার্থ যে কারণেই হোক পর দিনেই তাহার মতিগতিতে অচিন্তিতপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল।

দগ্ধমুখ রক্তবর্ণ শৃগালদের এক সভা আহ্বান করিয়া বলিল—কমরেড সব! অভূতপূর্ব্ব বিপদ! আমাদের দেশ নরাধম হস্তীটা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতেছে। ওই দেখো, হাতীটা চাঁদকে গিলিতে সুরু করিয়াছে।

সকলে আকাশের দিকে তাকাইয়া দেখিল সত্যই বটে চাঁদে কালো ছায়া। রক্তবর্ণের দল হায় হায় (মানুষে ভাবে হুয়া, হুয়া) করিয়া উঠিল।

দগ্ধমুখ বুদ্ধিমান। সে পঞ্জিকা দেখিয়া জানিয়া লইয়াছিল যে সন্ধ্যা বেলায় চন্দ্রগ্রহণ সুরু হইবে। গ্রহণের ছায়াকেই সে হাতীর ছায়া বলিয়া দেখাইয়া দিল। তবে যে রক্তবর্ণের দল বুঝিতে পারিল না, কারণ বুদ্ধি থাকিতে কেহ রক্তবর্ণের দলে ভেড়ে না।

রক্তবর্ণ শৃগালগণ বলিয়া উঠিল—সর্ব্বনাশ! আমাদের দেশ আক্রান্ত হইতেছে এখন কি উপায়?

দগ্ধমুখ বলিল—উপায় আর কি? এখন সিংহকে সাহায্য করিতে হইবে—আমাদের দেশ, জন্মস্থান আক্রান্ত, কাজেই এ যুদ্ধ আর সাম্রাজ্যবাদীর লড়াই নহে, ইহা এখন জন-যুদ্ধ! জন-যুদ্ধে সাহায্য করাই কর্ত্তব্য।

রক্তবর্ণের দল বলিল—সর্ব্বনাশ! তবে কি আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে? সে যে বড় কঠিন কাজ!

দগ্ধমুখ বলিল—যুদ্ধ আমাদের করিতে হইবে না। কেবল যে-চোঙা মুখে দিয়া 'সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাউক' বলিয়া চীৎকার করিতেছ, এখন সেই চোঙার সাহায্যে 'জন-যুদ্ধে যোগ দিউন' বলিয়া চীৎকার করিলেই চলিবে। জন-যুদ্ধ করিবার এই সহজ উপায় জানিতে পারিয়া রক্তবর্ণের দল পরম আশ্বস্ত হইল।

দগ্ধমুখ সিংহের নিকট হইতে গোপনে একটি কাজের ভার লইয়াছিল। সিংহ বলিয়াছিল—কমরেড দগ্ধমুখ, এ-যুদ্ধ এখন তো জন-যুদ্ধ। কিন্তু যে সব দুর্ব্বৃত্ত আমাকে তাহাদের দেশ হইতে তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাদের গ্রেপ্তার করিতে না পারিলে জন-যুদ্ধ জিতিবার আশা নাই। তুমি তাহাদের নাম ধাম যদি আমাকে সংগ্রহ করিয়া দাও, তবে তাহাদের গ্রেপ্তার করিবার ব্যবস্থা করিতে পারি। কি বলো?

দগ্ধমুখ বলিল—অবশ্যই করিব। কিন্তু…

সিংহ বলিল—নিশ্চয়ই। যুদ্ধ খরচের খাতে লিখিয়া তোমাকে প্রচুর টাকা দিব। তুমি লইতেছ, কেহ জানিতেও পারিবে না।

দগ্ধমুখ বলিল—তাই বলিয়া ভাবিবেন না যে টাকার লোভেই এমন করিতেছি—নিতান্তই কর্ত্তব্যের অনুরোধে—

সিংহ বলিল—তাহা কি আর জানি না! তোমাদের 'ইতিহাসের বস্তুগত ব্যাখ্যার' সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে।

দগ্ধমুখ অতিশয় নিরাপদ ও অতিশয় প্রিয় কাজ পাইল। যখন অন্যান্য ছোটখাটো রক্তবর্ণ শৃগাল পথের মাঝে চোঙা মুখে লাগাইয়া 'জন-যুদ্ধে যোগ দিউন' বলিয়া হাঁকিত তখন জাঁদরেল রক্তবর্ণদের লইয়া দগ্ধমুখ গোপন গোয়েন্দাগিরির কাজে নিযুক্ত থাকিত। তাহাদের নিষ্ঠা ও নিপুণতায় প্রতিদিন দলে দলে সিংহ-

বিরোধীগণ ধৃত হইয়া কারাগার পূর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল আর গাড়ী গাড়ী টাকা দগ্ধমুখের বিবরে গিয়া পড়িতে লাগিল।

অবশেষে একদিন সিংহের জয় হইল। দগ্ধমুখ সকলকে বলিল—ওই দেখো আমাদের দেশ হইতে শত্রুর ছায়া অপসারিত হইয়াছে। জন-যুদ্ধে জয় লাভ ঘটিয়াছে এবং আমরাই এ-যুদ্ধ জিতিলাম।

তারপরে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিল। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া সিংহের বৈরাগ্যোদয় হইল। সে রাজ্য ছাড়িয়া যাইতে মনঃস্থ করিয়া যাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল তাহাদের হাতে দেশের ভার সমর্পণ করিল।

দগ্ধমুখ বলিল—আর আমরা ?

সিংহ বলিল—তোমরা যে দগ্ধমুখ !

দগ্ধমুখ বলিল—আমরা বিদ্রোহ করিব আর তাহা যদি না পারি তো ধর্ম্মঘট করাইতে থাকিব।

কিন্তু ইতিমধ্যে টাকার যোগানি বন্ধ হইয়া যাওয়াতে তাহার দল ভাঙ্গিয়া গেল। অধিকাংশ রক্তবর্ণ বল্কল পরিয়া সরিয়া পরিল।

দগ্ধমুখেরও সরিয়া পরিবার ইচ্ছা। কিন্তু সকলে তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। গায়ের রঙ উঠাইতে পারিলে সে আত্মগোপন করিতে পারে। কিন্তু রঙ যে পাকা। কিছুতেই উঠিতে চায় না ! সে দেশী-বিদেশী অনেক অনেক রাজ্যের সাবান পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছে, কিন্তু লাল রঙটা মরণ-কামড় দিয়া লাগিয়া আছে। দগ্ধমুখ এখন নূতন সাবান খোঁজ করিয়া ফিরিতেছে ! পাঠক, তোমরা কেহ এমন সাবানের সন্ধান দিতে পারো, যাহাতে তাহার গায়ের লাল রঙটা উঠিয়া যায় ?

খুল্ল বিহার

ভিক্ষু নিচ্চধন (নিত্যধন) বিহার নির্মাণে উদ্যত হইয়াছে জানিতে পারিয়া নগরের রাজা ও ভূস্বামীগণ অর্থ সাহায্য করিতে উদ্যত হইল। ইতিমধ্যে নিচ্চধনের পবিত্র জীবন ও নিষ্ঠার কথা প্রবাদে পরিণত হইয়াছিল, তাহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করা সকলে কর্তব্য ও ধর্মকার্য মনে করিত।

সমবেত রাজা ও ভূস্বামীগণকে নিচ্চধন বলিল, আপনাদের অর্থ আমি গ্রহণ করিতে পারি না।

বিস্মিত ভাবে তাহারা শুধাইল, কেন শ্রমণ, আমরা কি অন্যায় করিয়াছি?

আপনারা পরজীবী ব্যক্তি, এ অর্থ তো আপনাদের নয়।

তবে কাহার এ অর্থ?

শস্যোৎপাদক প্রজাবৃন্দের।

তাহাদের প্রদত্ত রাজস্ব কি আমাদের রাজভাগ নয়?

কে রাজা, কে প্রজা? সকলেরিই কর্তব্য কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা শস্যোৎপাদন বা অন্য প্রকার সামাজিক শুভ কর্তব্য সম্পাদন। আপনারা কিছুই করেন না—এ অর্থ গ্রহণ এক প্রকার তস্কর বৃত্তি।

প্রজাগণ স্বেচ্ছায় দেয় এই অর্থ।

স্বেচ্ছায় দেয় না—আপনাদের দণ্ডের ভয়ে দেয়। দণ্ডের ভয় না থাকিলে কেহ দিত না।

সামাজিক শুভ কর্ম সম্পাদনে ব্যয় করি এই অর্থ আমরা।

সকলে নিজ নিজ সাধ্যানুসারে হিত কর্ম সম্পাদন করিলে আয়ব্যয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

ভিক্ষুর স্পষ্ট ভাষণে রাজা ও ভূস্বামিগণ রুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল।

তারপরে আসিল নগরের শ্রেষ্ঠিগণ। তাহারা বলিল, ভিক্ষু অর্থ গ্রহণ করুন, বিহার নির্মাণ সুসাধ্য হৌক।

নিচ্চধন বলিল, আপনাদের অর্থ গ্রহণ করিতে পারি না।

আমাদের কি দোষ? আমরা তো রাজা ও ভূস্বামিগণের ন্যায় পরজীবী নই।

আপনারা তাহাদের চেয়েও পাষণ্ড, আপনারা পরস্বাপহারক।

সৎপন্থায় ব্যবসা করিয়া যাহা লাভ করি তাহাই আমাদের বিত্ত।

ব্যবসায়ে সৎপন্থা বলিয়া কিছু নাই।

কেন?

বস্তুর প্রকৃত মূল্যের চেয়ে আপনারা কিছু বেশী লইয়া থাকেন।

ঐ টুকুই তো লাভ।

ঐ টুকুই তো পাপ।

লাভ না হইলে ব্যবসা করিব কেন?

পাপের মূল্যে ব্যবসা করিবেন? প্রত্যেক রজতখণ্ড পাপের দ্বারা চিহ্নিত।

আপনি সাধু, ব্যবসায়ের নীতি আপনার বুদ্ধির অগম্য।

পাপ পুণ্য আমার বুদ্ধির অনগম্য নয়।

তখন শ্রেষ্ঠীর দল রুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিল, তাহারা বলিতে লাগিল, শ্রমণের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। কেহ বলিল, না, শয়তান উহার ঘাড়ে ভর করিয়াছে। দেখি উনি কি ভাবে বিহার নির্মাণ করেন।

নিচ্চধন বুঝিল যে রাজা ও ভূস্বামিগণ এবং শ্রেষ্ঠীদের কাছে অর্থ লওয়া সম্ভব নয়। বাকি থাকিল ভিক্ষা কিন্তু ভিক্ষার অর্থ তো আসিবে ইহাদেরই কাছ হইতে। তাহাও লওয়া

চলে না। তবে কি ভাবে বিহার নির্মিত হইবে ভাবিতে লাগিল নিচ্চধন।

তখন সে স্থির করিল যে একক পরিশ্রমে বিহার নির্মাণ করিবে।

॥ ২ ॥

পর্বত হইতে প্রস্তরখণ্ড সংগ্রহ করিয়া বিহার নির্মাণে লাগিয়া গেল নিচ্চধন এবং সারাদিন পরিশ্রম করিয়া খানিকটা গড়িল।

কিন্তু কি আশ্চর্য ! ভোর বেলা জাগিয়া নিচ্চধন দেখিল যে কে যেন সেটুকু ভাঙিয়া দিয়াছে।

সেদিন আবার গড়িল আবার পরদিন ভোরে জাগিয়া দেখিল যে তাহা ভগ্ন। এই ভাবে প্রতিদিন যেটুকু গড়ে প্রতিদিন ভোরে সেটুকু ভগ্ন দেখিতে পায় ভিক্ষু। তখন ইহার প্রকৃত কারণ জানিবার জন্যে সে ধ্যানে বসিল। ধ্যানযোগে সে জানিতে পারিল যে ইহা তাহার চিরশত্রু মারের (শয়তানের) কর্ম।

তখন অন্যন্যোপায় নিচ্চধন অবলোকিতেশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিল, প্রভু, আমার বিহার তুমি রক্ষা করো। অবলোকিতেশ্বর তাহার প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া ধ্যানে আদেশ করিলেন—বৎস, তুমি বিহার নির্মাণ করো। পাহারার ভার আমি লইব।

অবলোকিতেশ্বরের আশ্বাস পাইয়া নিচ্চধন বিহার গড়া সুরু করিল। ভোর বেলা জাগিয়া দেখিল বিহার যেটুকু গড়িয়াছিল তেমনি আছে, ভাঙে নাই।

বৎসর কাল মধ্যে বিহার নির্মাণ শেষ হইল। বিহারের মধ্যে একটি মন্দির গড়িয়া তন্মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিল নিচ্চধন।

নিচ্চধনের বিহারের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল, শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ সেখানে বাসের নিমিত্ত আসিল।

একক অধ্যবসায়ে নির্মিত বিহারটি আকারে খুব বড় নয়, তাই ইহার নাম পড়িল খুল্ল বিহার (ক্ষুদ্র বিহার)।

খুল্ল বিহারের আচার্য নিচ্চধনের পবিত্র জীবনের খ্যাতি আরও বৃদ্ধি পাইল।

নিচ্চধনের পরীক্ষা

অবশেষে নিচ্চধনের (নিত্যধনের) স্বহস্তে নির্মিত খুল্লবিহারের যশ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এবং নানা দেশ হইতে শ্রমণ ও ভিক্ষুগণ আসিয়া জুটিতে লাগিল। বিহারটি নিতান্ত ক্ষুদ্র—কিন্তু নিচ্চধনের ধার্মিক খ্যাতি অসামান্য, তাই প্রবীণ স্থবিরগণও ক্রমে ক্রমে আসিতে লাগিলেন। নিচ্চধন সকালে ভিক্ষা সারিয়া আসিয়া বাকি সময়টা শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যানধারণায় কাটাইতেন। তারপরে সন্ধ্যাবেলায় অবলোকিতেশ্বরের পূজা করিতেন। ভিক্ষু ও শ্রমণ-গণও তাঁহার নেতৃত্বে ভিক্ষা, শাস্ত্রপাঠ ও ধ্যানধারণায় জীবনযাপন করিতেন।

নিচ্চধনের আত্মার উন্নতি ও যশের প্রসার দেখিয়া মারের (বৌদ্ধ পুরাণের শয়তান) মন হিংসায় পুড়িতে লাগিল। আগে একবার তাহাকে হীন প্রতিপন্ন করিতে গিয়া সে নিজে জব্দ হইয়াছিল কাজেই নিচ্চধনের প্রতি হিংসা এখন ভয়ানক আকার ধারণ করিল। মার তাহাকে লোকচক্ষে হেয় করিবার নূতন পন্থা চিন্তা করিতে লাগিল।

সেদিন মহাপরিনির্বাণ তিথি উপলক্ষ্যে খুল্লবিহারে চৈত্য প্রতিষ্ঠা উৎসব। কানায় কানায় জ্যোৎস্নাপূর্ণ আকাশের তলে চৈত্যবেদীমূলে সকলে সমবেত, সকলের পুরোধা নিচ্চধন। এমন সময়ে অধ্যেতা কোন কাজে বিহারে প্রবেশ করিয়া শুনিতে পাইল যে নিচ্চধনের প্রকোষ্ঠে মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছে। কৌতূহল-বশে সেই প্রকোষ্ঠে উঁকি মারিয়া দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গেল সে। একি। নিচ্চধনের শয্যায় বসিয়া পরমা সুন্দরী এক

তরুণী বীণা বাজাইয়া গান গাহিতেছে, তাহার সম্মুখে সুবর্ণ থালায় নানাবিধ খাদ্য আর সুবর্ণ পাত্রে ভিক্ষুর অপেয় মদ্য !

বিস্ময় কাটিলে অধ্যেতা বলিল, আপনি কে, আর এখানেই বা কেন ?

সুন্দরী বীণার চেয়ে মনোরম কণ্ঠে বলিল, আমি নগরের প্রধানা নটী, নিচ্ছধনের আহ্বানে আসিয়াছি।

অধ্যেতা বলিল, এ যে অসম্ভব। নিচ্ছধন ভিক্ষু, পবিত্র তাঁহার জীবন।

তাহা হইলেও সে মানুষ ছাড়া আর কিছু নয়। ভালো, বাদানুবাদে প্রয়োজন কি। তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিয়া দেখো না কেন।

তখন অধ্যেতা দ্রুত নিচ্ছধনের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিল।

নটী বীণা বাদন করিয়া পূর্ববৎ গান করিতে লাগিল।

॥ ২ ॥

অধ্যেতা উপাধ্যায়, আচার্য ও অন্য সব ভিক্ষুগণের সহিত নিচ্ছধন আসিয়া উপস্থিত হইলে নিচ্ছধন বলিল, আর্যা, আপনি কে, এখানে কেন ?

রমণী মধুর হাসিয়া বলিল, প্রিয়তম, তোমার আহ্বানেই যে আসিয়াছি, ইতিমধ্যে কি সব ভুলিয়া গেলে না লজ্জায় এরূপ বলিতেছ।

রমণীর কথা শুনিয়া অনেকে কানাকানি করিতে লাগিল। কিন্তু নিচ্ছধন বুঝিল, আর কিছুই নয়, রমণী ছদ্মবেশী মার, তাহার পুরাতন শত্রু। তখন সে নতজানু হইয়া অবলোকিতেশ্বরের কাছে প্রার্থনা আরম্ভ করিল।

মুহূর্ত পরে সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল যে গৃহ শূন্য, বীণা, ভোজ্য ও পেয় কিছুই নাই। সকলে আরো বিস্ময়ের শুনিল যে দৈববাণী ধ্বনিত হইতেছে—

মানবের চির শত্রু মার
নানারূপে করে অত্যাচার।
বুদ্ধের শরণাগত জন
মুক্তি পায় যথা নিচ্চধন॥

সকলে তখন ভগবানের অপার করুণা দর্শন করিয়া নিচ্চ ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল।

ꞌGOVERNMENT OF TRIPURA

ꞌE OF THE DEPUTY CHIEF MINISTER

AGARTALA.

.... *Dated*......................................